সুবোধ ঘোষ

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রক :
গণেশপ্রসাদ সরাফ্
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য : তিন টাকা মাত্র

জলকমল

: এই লেখকের অন্যান্য বই :

ভারত প্রেমকথা, ফসিল, শুন বরনারী, বর্ণালী, মনোবাসিতা, সুজাতা, শতকিয়া, ত্রিযামা, একটি নমস্কারে, রূপসাগর, ভোরের মালতী, সীমন্ত সরণি ইত্যাদি।

যেন ভুটিয়া-কম্বলে ঢাকা একটা লাস। সত্যিই, দেখে কিছু বোঝা যায় না, মানুষটা জীবিত না মৃত। কর্কশ কম্বলটা টান হয়ে ছড়িয়ে আছে; আর কম্বলের আড়ালে মানুষটাও টান হয়ে শুয়ে আছে। মনে হতে পারে, লোকটা গভীর ঘুমের ভারে একেবারে অসাড় হয়ে আছে। কিন্তু এ কেমন অসাড়তা? ঘুমন্ত মানুষ যদি হয়, তবে তার বুকটা একটুও ধুকপুক করে না কেন? কম্বলটাও যে একেবারে অসাড়। একটুও উসখুস করে না। মানুষটার পা কোন্ দিকে, আর মাথাটাই বা কোন্ দিকে, তাও যে ঠাহর করা যায় না। হলোই বা শীতের রাত, কম্বল-ঢাকা আরামের উষ্ণতা যতই সুখকর হোক না কেন, এভাবে এতক্ষণ ধরে নাকমুখ চাপা পড়ে থাকলে এক-আধবার হাঁসফাঁস করে উঠতেও তো হয়। কিন্তু না, শয়নে পদ্মলাভ অবস্থাও না; তার চেয়েও ঘোরতর একটা নিথরতার সুখ। যেন একটা নির্বিকল্প সমাধি।

ট্রেনের এই কামরার ঐ সীটের উপর ভুটিয়া-কম্বলে ঢাকা এই সত্তাটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন যাত্রী ছিল না। সত্তাটি আবার টান হয়ে শুয়ে একেবারে নিথর হয়ে রয়েছে। তাই এই কামরায় ঢুকতে গিয়ে অপূর্ব বুঝতে পারেনি, আর শমিতা দেখতে পায়নি যে, কামরার ভিতরে এমন একটা অসুবিধা চুপ করে ঘুমিয়ে আছে। চোখে পড়লো তখন, যখন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে দু'জোড়া হাতের ব্যস্ততা দিয়ে যত বাক্স-বিছানা, যত পেঁটরা আর পোঁটলা, যত বাস্কেট আর প্যাকেট গোনাগুনি করে সাজিয়ে ফেলেছে। কুলীরাও চলে গিয়েছে। মুরি জংশনের মাঝরাতের ক্লান্ত কোলাহলও একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে। আর, ওধারের খোলা জানালা দিয়ে হিমেল

বাতাস আর ছেঁড়া-ছেঁড়া কুয়াশা সিরসির করে কামরার ভিতরে ঢুকছে।

শমিতা বলে,—জানালাটা বন্ধ করে দাও।

অপূর্ব ব্যস্ত হতে গিয়েই চমকে ওঠে—ও হরি!

শমিতা—কি?

অপূর্ব চোখের ইসারায় দেখিয়ে দেয়, সেই জানালার কাছে একটা ভুটিয়া-কম্বল টান হয়ে পড়ে আছে। শমিতার চোখের চাহনিও হঠাৎ চমক খেয়ে যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। মুখের ভাবটাও অপ্রসন্ন হয়ে যায়; যেন এতক্ষণের একটা কল্পনার সুখ হঠাৎ আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল। একটা সাধের আশার মাথায় বাড়ি পড়লো।

কম্বলে ঢাকা মানুষটাও একজন প্যাসেঞ্জার; কিন্তু কী বিশ্রী প্যাসেঞ্জার। মনে হয়, একটা ধূর্ত অসুবিধা যেন এতক্ষণ চোরের মতো লুকিয়ে ছিল; তাই এতক্ষণ চোখে পড়েনি। কে জানে কতদুর থেকে আসছে প্যাসেঞ্জারটা, আর নামবেই বা কোন্ স্টেশনে?

অপূর্ব আর শমিতা; স্বামী আর স্ত্রী; মাত্র সাত-মাস হলো বিয়ে হয়েছে যাদের, তাদের জীবনের সম্পর্কটাকে রাতের রেলগাড়ির এই নিরিবিলি কামরাটা বাসরমায়া দিয়ে বিহ্বল করে নিয়ে কুহেলিকাময় একটা রহস্যের ভিতর দিয়ে ছুটে চলে যাবে, যতক্ষণ না ভোর হয় আর সূর্য ওঠে, আর মহুয়ামিলান নামে একটা স্টেশনের কাছের শালবনের মাথার উপর দিয়ে তিতিরের ঝাঁক উড়তে শুরু করে।

শুধু নামটাই শুনেছে শমিতা, জায়গাটার নাম মহুয়ামিলান; চারদিকে পাহাড় আর শালবন। দূরের জঙ্গলের বুকের ভিতর থেকে নতুন কলিয়ারির ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়; আর আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তবে অনেকদূরের পাহাড়ের মাথার উপরে আমঝরিয়া ডাকবাংলার ফুটফুটে চেহারাটাও চোখে পড়ে। অপূর্বও

গল্প করে বলেছে, একটা বাইনকুলার থাকলে ডাকবাংলার লনের চারদিকের টকটকে লাল গাঁদার স্তবকগুলিও স্পষ্ট দেখা যায়।

বলতে ভুল করেনি অপূর্ব, মহুয়ামিলানও যেন একটা নীরবতাময় নিভৃত। সোরগোল নেই, হাঁকডাক নেই। নিকটে কোন হাটবাজার নেই। একটা দোকানও নেই। আদালত কাছারি, হাসপাতাল, ইস্কুল কিছুই নেই। স্টেশনে আছেন মাস্টারমশাই; তাঁর কোয়ার্টারের পাঁচিলের গায়ে অবশ্য ভেজা রঙীন শাড়ি শুকোচ্ছে দেখা যায়; মাস্টারমশাই-এর ঘরে তাঁর স্ত্রী আছেন; আর পাঁচটি ছেলেমেয়েও আছে। তা ছাড়া আছে পয়েন্টস্‌ম্যান আর চৌকিদার, আর রেলের কাজের জন তিন-চার কুলী।

স্টেশন থেকে কিছু দূরে দুটো শৌখিন বাংলাবাড়ি আছে। বাড়ির মালিক বছরে এক-আধবার আসেন। বড়জোর এক সপ্তাহ থাকেন। তিতির শিকার করেন; মহুয়ামিলানের কূয়োর জল আর তিতিরের মাংস অনবরত খান। তারপর হঠাৎ, মাত্র ছয়-সাতটা দিন পার হতেই স্টেশনে এসে ওজনকলের উপর দাঁড়িয়ে হিসাব করেন, কত সের কত ছটাক ওজন বেড়েছে। হরপ্রসাদবাবু বলেছিলেন, সাত দিনের মধ্যেই তাঁর আড়াই সের ওজন বেড়েছে। কলকাতা যাবার সময় দুটি ড্রাম ভর্তি করে মহুয়ামিলানের কূয়োর জল নিয়ে গিয়েছেন হরপ্রসাদবাবু।

ধরণী সরকার কিন্তু একবার বেশ রাগ করেছিলেন। মহুয়া-মিলানে এসে মাত্র তিন দিন থাকবার পরই তিনি সন্দেহ করলেন, সুগার বেড়েছে। মহুয়ামিলানের জলেরই বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ চরম হয়ে উঠেছিল। রাঁচিতে ভাগ্নেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, যেন ভাগ্নের পুরনো বাড়ির বাগানটার উত্তরদিকের কূয়োর জল, অন্তত এক কলসী করে রোজই মহুয়ামিলানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

পর পর দু'দিন জল এসেছিল। রাঁচি লাইনের মোটর-সার্ভিসের ড্রাইভার জলের কলসীটাকে সড়কের ধারে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। আর, ধরণী সরকারের চাকর দশ মাইল পথ হেঁটে বড় সড়কের ধারে একলা-পড়ে-থাকা সেই জলভরা কলসীটাকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু আবার সন্দেহ করেছিলেন ধরণী সরকার। সার্ভিস-বাসের ড্রাইভারকে নয়; তাঁর বিশ্বস্ত ভাগ্নেকেই সন্দেহ করেছিলেন। স্টেশনের মাস্টারমশাই-ও শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন, হরপ্রসাদবাবুর ভাগ্নে ভদ্রলোক নাকি সার্ভিস-বাসের ড্রাইভারকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যেন মহুয়ামিলানের কাছাকাছি এসে, পথের ধারের যে-কোন গাঁয়ের কূয়োর জল একটা কলসীতে ভরে নিয়ে আবার পথের ধারেই রেখে দিয়ে চলে যায়। সেজন্যে ড্রাইভারকে রোজ চার আনা বকশিশ দিতে শুরু করেছিলেন ভাগ্নে। অথচ মাত্র আর আট আনা পয়সা খরচ করলে সোজা রাঁচি থেকেই জল পাঠাতে পারা যেত। এক-কলসী জলের ভাড়া বারো আনার বেশি হতো না। কিন্তু··· স্টেশনের মাস্টারমশাই-এর কাছে এসে ধরণীবাবু হতাশভাবে আক্ষেপ করেছিলেন, মাত্র আট আনা পয়সা বাঁচাবার জন্যে মানুষ এতবড় শঠটাও করে।

ধরণী সরকারের বাংলাবাড়িতে জলপাই গাছ আছে; আর, হরপ্রসাদবাবুর বাড়ির বাগানে কচি কচি চারটে দার্চিনি গাছ। মুরি জংশনের ওয়েটিং-রুমের নিভৃতে শীতের অলস সন্ধ্যাটাকে তাড়া-তাড়ি রাত করে দেবার জন্যই বোধহয় মহুয়ামিলানের বিচিত্রতার যত গল্প বলেছে অপূর্ব; আর শমিতাও অদ্ভুত একটা খুশির আবেশে মুগ্ধ হয়ে সে-সব গল্পের বিস্ময়কে যেন কান দিয়ে গিলেছে। চোখ-দুটোও মাঝে মাঝে যেন জ্বলজ্বল করে হেসেছে। ছোট্ট মহুয়ামিলানকে একটা সুস্বপ্নের রঙীন ছবি বলে মনে হয়েছে।

অপূর্বর কল্পনাগুলিও অদ্ভুত। কিন্তু অদ্ভুত হলেও বড় মিষ্টি।

—হরপ্রসাদবাবুর বাগানের দার্চিনি কিন্তু মাঝে মাঝে চুরি করতে হবে, শমিতা।

—চুরি করবো?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—চুরি যদি করতে পার, তবে বুঝতে পারবে এই চুরিও কত মিষ্টি!

—তার মানে?

—তা হলে শোন। হরপ্রসাদবাবুর দার্চিনি গাছের গায়ে হাত দেবার কারও সাধ্যিই নেই; কারণ, দার্চিনি গাছ সারাক্ষণ পাহারা দেবার জন্য একটা নেপালী দারোয়ান আছে। গাছের দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখলেই দারোয়ানটা কটমট করে তাকায়। একটা পাতাও কাউকে ছুঁতে দেয় না। হাত তুললেই হেই-হেই করে তেড়ে আসে। কিন্তু···তবু···একটু বুদ্ধি করলেই চুরি করা যায়।

—কেমন করে?

—বেড়াতে বেড়াতে তুমি দার্চিনি গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে; আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবো। তোমাকে নিশ্চয় একটু কম সন্দেহ করবে দারোয়ান। যাই হোক, তবু গাছের গায়ে হাত দেবার সুযোগ কিন্তু পাবে না। দারোয়ানটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তোমার হাত-দুটোর ওপর নজর রাখবে। অগত্যা···তুমি বেশ ভালোমানুষটির মতো গাছের একেবারে কাছাকাছি হয়ে এমন একটা ভঙ্গী করবে যে, তুমি যেন গাছটাকে ভালো করে দেখছো। গাছের গায়ের কাছে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে আর দেখতে দেখতে হঠাৎ গাছের গায়ে দাঁত বসিয়ে দেবে। বেশ জোরসে কামড়ে ধরে গাছের বাকলের একটা চাকলা উপড়ে নিয়ে মুখের ভিতরে রেখেই চুপচাপ

চলে আসবে। দারোয়ান বেচারার চোখ তোমার হাত-দুটোকে যত সন্দেহই করুক, তোমার এই সুন্দর মুখটাকে এত ধূর্ত বলে কখনই সন্দেহ করতে পারবে না। যাক, তারপর গাছের কাঁচা বাকলের টুকরোটাকে আস্তে আস্তে চিবোবে; তখন বুঝবে এই চুরি কত মিষ্টি চুরি।

হাসতে হাসতে অপূর্বর গায়ের উপর প্রায় লুটিয়ে পড়েছিল শমিতা। কিন্তু পরমুহূর্তেই ধড়মড় করে সরে যেতে হয়েছিল। কারণ, স্টেশনের ঝাড়ুদার বুড়ো ঠিক সেই সময়ে একটা হাই তুলে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। শমিতাও চকচকে একটা বস্তুকে ছোট বাস্কেটে ভরতে ভরতে আর হঠাৎ-ব্যস্ততার ভান করে প্রশ্ন করেছিল,—পানের বাটা তো সঙ্গে নিয়ে চললে, কিন্তু তোমার মহুয়ামিলানে পান পাওয়া যাবে তো?

—না।

—তবে?

—তবে আর কি? বাটাটা মিছিমিছি পড়ে থাকবে।

—মিছিমিছি পড়ে থাকা কি ভালো? তার চেয়ে ভালো ছিল, যদি বাড়িতে রেখে আসা হতো। এটার ওপর মেজদির বেশ একটু লোভও হয়েছিল দেখেছি। মেজদির পান খাওয়ার অভ্যেস আছে, অথচ দেখেছি, বাড়িতে একটা পেতলের বাটা-ও নেই। বেচারা চীনেমাটির একটা ভাঙা ডিসে পান রাখেন।

—এতই যদি দেখেছিলে আর বুঝেছিলে, তবে এটা নিয়ে এলে কেন?

—তাই তো, ভাবতে এখন একটু খারাপই লাগছে, কেন নিয়ে এলাম।

—এরকম আরও কাণ্ড তো করেছ দেখেছি।

শমিতা চোখ বড় করে তাকায়।—কিরকম?

—চারটে থালা সঙ্গে আনার কি দরকার ছিল? তা ছাড়া ছ'টা গেলাস আর চারটে দুধের বাটি? বস্তাবন্দী করে কাঁসা-পেতলের এরকম একটা খাগড়াই কারখানা সঙ্গে করে নিয়ে আসবার কোন দরকার ছিল না।

—আমায় দোষ দিয়ো না। আমি মেজদিকে বারণ করেছিলাম। কিন্তু…

—কি?

—মেজদি আমার বারণ কানেই তুললেন না। উল্টে এমন একটা কথা বললেন যে, আমি আর…

—কি?

—আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না।

—মেজবউদি কথাটা কী বললেন, সেটা বল।

—বললেন, এখন না হয় চারটে দুধের বাটি দরকার হবে না, কিন্তু একদিন তো দরকার হবে।

—তার মানে?

—তার মানে তুমি একটি…

—কি?

—আমি বলতে পারবো না; কারণ ওটা আমার কথা নয়। মেজদিই বলেছেন।

—কি বলেছেন মেজবউদি? আমার নামে কোন নিন্দের কথা?

—হ্যাঁ।

—কী, শুনি?

—আমায় দোষ দেবে না বল?

—মেজবউদির কথার জন্যে তোমাকে দোষ দেব কেন?

—মেজদি বললেন, তুমি একটি কাঠুরে। শুধু গাছের সংসারের

দরকারটুকু বোঝ ; মানুষের সংসারে কী দরকার, সেদিকে তোমার হুঁসই নেই।

—মেজবউদি মিথ্যে বলেননি, ফরেস্টের রেঞ্জারগিরি করে যে, সে লোকটা কাঠুরে বৈকি! কিন্তু আমার হুঁস-টুস নেই বলে একটা মিথ্যে অপবাদ দেবার মানেটা কি?

—বুঝে দেখ?

—কিছু বুঝতে পারছি না।

—মানুষের সংসারে ক'টা থালা আর ক'টা বাটি একদিন দরকার হয়ে পড়ে, সেটা বুঝতে পার না?

—অ্যাঁ?

—কেন দরকার হয়, তাও বুঝতে পার না?

কি বললে?

কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে ওয়েটিং-রুমের জানালাটার দিকে তাকাবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নেয় শমিতা। অপূর্বও হঠাৎ হেসে ওঠে। শমিতার নিরীহ মুখটা যেন হঠাৎ ধূর্ত হয়ে লুকিয়ে পড়বার একটা আড়াল খুঁজছে। আর, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যেন একটা হাসি চাপতেও চেষ্টা করছে শমিতা।

—বুঝেছি। চেঁচিয়ে ওঠে অপূর্ব।—ধন্য মেজবউদির দূরদর্শিতা!—

শমিতা ভ্রূকুটি করে মুখ ফেরায়, কিন্তু হাসি চেপে রাখতে আর পারে না। যেন, অপূর্বর কাঠুরে বুদ্ধির অন্ধতাকে আরও একটু লজ্জা দেবার জন্য ধমক দেয়,—চুপ কর।

—কেন? ঘরে তো কেউ নেই।

—না থাকুক, তবু এসব কথা একলা শুনতেও লজ্জা লাগে।

কিন্তু ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় শমিতা। আর, একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিনিসপত্রগুলির দিকে তাকায়।—ছোট সতরঞ্চিতে জড়ানো আসনগুলি গেল কোথায়?

অপূর্বও উদ্বিগ্ন হয়।—তাই তো

শমিতাই শেষে আবিষ্কার করে, ওয়েটিং-রুমের বেঞ্চের উপর রাখা সতরঞ্চিতে জড়ানো সেই বাণ্ডিলটার উপর বসে আছে অপূর্ব।

—সরো দেখি।—অপূর্বর হাতে একটা চিমটি কেটে নিয়ে বিড়বিড় করে শমিতা,—মেজবউদি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। দূরদর্শিতা দূরের কথা, একটা সাধারণ নিকটদর্শিতাও নেই।

অপূর্ব বলে, আমার এই ভুলটাকেও কাঠের বুদ্ধির ভুল বোলো না।

শমিতা—আমি কিছুই বলতে চাই না। এখন, আমাকে একটু কাজ করতে দাও; বকবক করে বাধা দিয়ো না!

—এখন আবার কী কাজ করবে?

—জিনিসপত্রগুলি একবার গুনে দেখি। রামগড় থেকে রওনা হবার সময় ছোট-বড় সবসুদ্ধ উনিশটা ছিল। মুরিতে বাস থেকে নামবার সময় তুমি কুঁজোটা নামাতে ভুলে গিয়েছিলে। অগত্যা, দাঁড়ালো মোট আঠারোটা। তা ছাড়া, তোমার আলোয়ানটাও আছে। ট্রেনে ওঠবার সময় আমি কিন্তু আঠারোটি জিনিস গুনে নেব। তোমার আলোয়ানের দায়িত্ব তোমারই। আবার যদি ভুল কর তবে…

—জরিমানা করবে?

—হ্যাঁ। যদি ভুল করে এই আলোয়ান হারাও, তবে আমি আর জীবনে কোন আলোয়ান গায়ে দেব না। মনে রেখ, বাবা নিজে কলকাতায় গিয়ে, অনেক দোকান ঘুরে, তোমার জন্যে এই আলোয়ান কিনেছিলেন।

—কেন? এত পরিশ্রম করবার…

—আদরের জামাইকে তুষ্ট করতে হলে এরকম একটু পরিশ্রম করে ভালো জিনিস কিনতে হয়। কে জানে, নতুন জামাই যদি

পছন্দ হলো না বলে মুখভার করে, তবে যে ধর্মের মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

অপূর্ব—আমাকে এসব কথা বলবার মানে? আমি কি···

অপূর্বর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে শমিতা।—ক্রোধ সংবরণ করুন, প্রভু; জানি, আপনি একটা সামান্য আলোয়ানের কাঙাল নন। আপনি কোন পণ দাবি না করে এক কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব ডাক্তারের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। আপনি উদার; এবং সেই কারণেই ভয় করিতেছি, আপনি হয়তো এই আলোয়ানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া হারাইয়া ফেলিবেন।

অপূর্বও হাসে।—তুচ্ছ করিব না; কিন্তু ভুল হইতে পারে, সুতরাং···

হ্যাঁ, রাত মন্দ হয়নি। ওয়েটিং-রুমের বুকটাও শীতাক্ত হয়ে উঠেছে। আলোয়ানটাকে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অপূর্ব বলে, —ঠিকই বলেছ, একটু সাবধান থাকা ভালো।

ঠিক সময়েই সাবধান হয়েছিল অপূর্ব। কারণ, ট্রেন আসবার সময় হয়েছিল। মাঝরাতের নীরবতাকে হঠাৎ ঝনঝনিয়ে দিয়ে ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। কুলী আর ফেরিওয়ালার দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে।

তারপর এই ট্রেন, যে ট্রেন শীতের রাতের মাইল-মাইল কুয়াশার নিবিড়তা ভেদ করে অপূর্ব আর শমিতার জীবনকে যেন কোলে করে নিয়ে পৃথিবীর এমন এক ঠাঁই-এর কাছে পৌঁছে দেবে, যেখানে রেঞ্জারবাবুর কোয়ার্টার এখন নতুন চুনকামে ধবধবে হয়ে পৃথিবীর এক নববিবাহিত দম্পতির সুখের গৃহস্থালির আনন্দ বরণ করবার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছে। এখন কত কথা বলাবলি করবার আছে। বাবার কথা ভেবে হয়তো বার বার শমিতার চোখ ভিজে যাবে; কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, অপূর্বর বুকের উপর চোখ ঘষে একটু শান্ত হবার সুযোগও

পাওয়া যাবে না। আর, অপূর্বও কি শমিতার মাথাটাকে বুকের উপর চেপে ধরে কোন সান্ত্বনার কথা বলতে পারবে? পারবে না। সে সুযোগই পাওয়া যাবে না।

বাধা হলো ঐ, নিস্পন্দ লাসের মতো কম্বল-ঢাকা হয়ে পড়ে আছে ঐ যে-প্যাসেঞ্জারটা। কে জানে, লোকটা বাঙালী কিনা। বাঙালী হলে যে আরও বাধা। একটা ভালো কথা মুখ খুলে বলতে পারা যাবে না। যদি বাঙালী না হয়, তাতেই বা কি-এমন সুবিধা? লোকটা যে-কোন মুহূর্তে কম্বলের আড়াল সরিয়ে দিয়ে, আর ছুটো কটকটে চোখ বের ক'রে অপূর্ব ও শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ফেলতে পারবে। হয়তো সারাটা পথই ওভাবে তাকিয়ে থাকবে। একটুও স্বস্তি পাওয়া যাবে না।

ট্রেন চলতে শুরু করে। ওদিকের সীটের উপর পাশাপাশি বসে অপূর্ব আর শমিতা, তুজনে শুধু তুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তু'চোখের চাহনি যেন একটা আশাভঙ্গের আঘাতে বিষণ্ণ। ঐ প্যাসেঞ্জারটা না থাকলে শমিতা আর অপূর্বকে এভাবে পাশাপাশি থেকেও এতটা আলগা হয়ে বসে থাকতে হতো না।

চায়ের একটা শূন্য কাপ প্যাসেঞ্জারটার সীটের কাছেই মেঝের উপর পড়ে আছে। বোধ হয় টাটানগরে এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে লোকটা সেই-যে ঘুম দিয়েছে, তারই জের এখনও চলেছে। তবু রাগ হয়, যেন এক কাপ বিষ খেয়ে লোকটা আত্মহত্যা করেছে। তা না হলে, এত অসাড় হয়ে ঘুমোবার সাধ্যি কোন মানুষের হতে পারে না।

লোকটা অন্তত একবার জাগুক। কম্বলে ঢাকা সমাধি থেকে একবার মুখটা বের করুক। তাতে অন্তত এটুকু বোঝা যাবে, লোকটা কেমনতর লোক। বুড়ো না ছোঁড়া? সত্যি ভদ্রলোক, না ছোটলোক-গোছের ভদ্রলোক?

কিন্তু লোকটা জাগবে বলে মনে হয় না। সেরকম কোন লক্ষণই নেই। অপূর্ব ফিসফিস করে। —আমার সন্দেহ···

শমিতার চোখ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। —কি?

—লোকটা একটা রুগী। বোধ হয় বসন্ত হয়েছে। তা না হলে এভাবে আগাগোড়া কম্বল ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকবে কেন?

—তাহলে উপায়?

—উপায় এই যে, পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে গার্ডকে একটা খবর দিতে হবে।

—পরের স্টেশন আসতে কতক্ষণ?

—ভোর হয়ে যাবে। এই ট্রেন সোজা বড়কাকানা জংশনে পৌঁছে তবে থামবে। তার আগে কোন হল্ট নেই।

—তাহলে আর কি ছাই সুবিধা হবে?

—না, কোন সুবিধে হবার আশা নেই। যাই হোক···থাক্‌গে··· দুটো ম্যাগাজিন বের করা যাক্‌। একটা তুমি, আর একটা···

—মাঝরাতে ম্যাগাজিন পড়তে তোমার যদি সাধ থাকে, তবে তুমি পড়। আমার সাধ নেই।

—তুমি তবে কি করবে?

—বিরক্ত কোরো না।

—বিরক্ত করছি? আমি? কি আশ্চর্য!

—যে-কথা বলবার কোন দরকার নেই, কোন মানে হয় না, সে-কথা বললে বিরক্ত করাই হয়।

—তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

—ঘুম আসবে না।

—তবে তোমার লেস আর কাঁটা বের কর।

—জানি না, লেস আর কাঁটা কোন্‌ বাক্সে আছে।

—আমি খুঁজে দেখছি।

—না। কোন লাভ নেই।

—কেন ?

—খুঁজতে খুঁজতে তুমিই ভোর করে দেবে। তোমার কাজের রকম আমার জানা আছে।

কিন্তু শমিতার আপত্তি গ্রাহ্য করে না অপূর্ব। বাক্স খোলবার জন্য তৈরি হয়। সীট থেকে উঠে বাংকের উপর রাখা একটা বাক্সের তালার দিকে চাবি তুলে ধরতেই শমিতা ভ্রূকুটি করে। —ওটার মধ্যে লেস আর কাঁটা নেই। ওটার মধ্যে শুধু আচারের শিশি, খেজুরের গুড় আর স্টোভটা আছে।

একটা প্যাকেটের বাঁধন খুলতে চেষ্টা করে অপূর্ব। শমিতা এবার প্রায় ধমকের সুরে চেঁচিয়ে উঠে বাধা দেয়। —ওটার মধ্যে শুধু দশ গজ পপলিন আর বারো গজ লংক্লথ আছে। না বুঝে-সুঝে কেন ঘাঁটাঘাঁটি করছো ?

এইবার একটা চামড়ার ব্যাগের দিকে হাত বাড়ায় অপূর্ব। শমিতা প্রায় আতঙ্কিতের মতো একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। —সাবধান !

—কি হলো ?

—ওটাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন ?

—কী আছে ওটার মধ্যে ?

—যাই থাকুক না কেন, লেস আর কাঁটা ওটার মধ্যে নেই।

—থাকতেও পারে তো ? যদি ভুল করে····

—না, এরকম ভুল আমার হয় না। ওটার মধ্যে লেস আর কাঁটা থাকতেই পারে না।

—তাহলে আছেই বা কি ?

—শুনে দরকার নেই।

—দরকার আছে।

—তর্ক করছো কেন ?

—তোমারই বা একটা মুখের কথা বলতে এত আপত্তি কেন ?

—ওটাতে চিঠি আছে।

—চিঠি ? কিসের চিঠি ?

—প্রেমের চিঠি।

—কার প্রেমের চিঠি ?

—এক ভদ্রলোকের।

—ভদ্রলোকের প্রেমের চিঠি তোমার ব্যাগে থাকবে কেন ?

—আমি রাখলে থাকবে না কেন ?

—তুমিই বা রাখবে কেন ?

—আমার কাছে লেখা চিঠি আমি রাখবো না তো কে রাখবে ?

—তোমার কাছে লেখা চিঠি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মিথ্যেকথা বলছো।

—না। খাঁটী সত্যিকথা।

—কে এই অদ্ভুত ভদ্রলোক, যে তোমাকে সাহস করে চিঠি লিখতে···

—সে ভদ্রলোক ফরেস্টের রেঞ্জারগিরি করেন। সম্প্রতি চিত্রপুর থেকে মহুয়ামিলানে বদ্‌লি হয়েছেন। জঙ্গলের ভেতরে থেকেও প্রতি সপ্তাহে স্ত্রীকে তিনপাতা চিঠি লিখতে ভুলে যায়নি যে-ভদ্রলোক, তারই চিঠি।

বোধ হয় শমিতার হাতটা চেপে ধরবার জন্য অপূর্বর হাতটা হঠাৎ উল্লাসে দুলে ওঠে। কিন্তু শমিতাও যেন হঠাৎ আতঙ্কে একটু সরে গিয়ে চোখের ভুরু কাঁপিয়ে কি-যেন ইশারা করে। চাপা গলায় ফিসফিস করে শমিতা,—আঃ, করছো কি। দেখতে পাচ্ছনা ?

না, দেখতে পায়নি অপূর্ব। কিন্তু শামতা
ফলেছে, কম্বল-ঢাকা প্যাসেঞ্জারটা মুখ বের করে উঁকি দিয়েছে। আর, যা ভয় করেছিল দুজনে, ঠিক তাই হয়েছে। লোকটা দু'চোখে যেন একটা কট্‌কটে দৃষ্টি তুলে অপূর্ব আর শমিতাকে দেখছে।

চোখে পড়ে অপূর্বর; ছেঁড়া-ছেঁড়া খবরের কাগজটা চার ভাঁজ হয়ে খাবারের ঝুড়ির গায়ে গোঁজা। এক টান দিয়ে খবরের কাগজটাকে হাতে তুলে নিয়ে আবার সীটের উপর ব'সে পড়ে অপূর্ব। হলোই বা দু'দিন আগের কাগজ; তিনবার পড়া পুরনো খবরগুলির উপরেই চোখ বোলাতে থাকে। কাগজটার গায়ে ঘি-এর ছোপ লেগে আছে, কারণ কাল বিকেলে রাঁচির হোটেলের ঘরে সকালবেলার চা-এর সময় এই কাগজের উপরে হালুয়া আর নিমকি রাখা হয়েছিল। তবু, যাই হোক, এহেন কাগজটাও এখন কাজ দিচ্ছে ভালো। কাগজটাকে টান করে মেলে নিয়ে তারই পিছনে মুখ আড়াল করতে পারা যাচ্ছে। এমন কি, শমিতাও অপূর্বর একটু কাছ ঘেঁসে বসে পড়েছে। কাগজের আড়ালে শমিতার মুখটাও ঢাকা পড়েছে; প্যাসেঞ্জারের কট্‌কটে দৃষ্টিটা বেশ জব্দ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। তাকিয়ে থাকুক, যতক্ষণ না ওর দুর্বুদ্ধির ভুলটা আরও জব্দ হয়ে যায়। অচেনা এক ভদ্রলোক ও তার স্ত্রীর মুখেরদিকে তাকাবার লোভটা শুধু ঘি-এর ছোপ লাগা একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হতাশ হয়ে যাক্।

জানালাটা খোলা যায় না; কারণ বাইরের বাতাস যেন কন্‌কনে ঠাণ্ডার হল্‌কা। তা ছাড়া, বাইরে বড় অন্ধকার; তাকিয়ে থাকলেও কিছু দেখা যায় না। তার চেয়ে এইভাবে একটা খবরের কাগজের আড়ালে দুটি মুখকে পাশাপাশি রেখে আস্তে আস্তে গল্প করাই ভালো। , এমন কি···

অসুবিধা কিছুই দেখতে

পকেট থেকে রুমাল বের করে অপূর্ব; আর, রুমাল তুলে নিয়ে

আস্তে আস্তে, যেন খুব সাবধানী আর খুঁতখুঁতে আর যত্নপটু আর্টিস্টের হাত, শমিতার কপালের কুম্‌কুমের টিপের ডানদিকটাকে একটু ঘষে দেয় অপূর্ব। টিপটা একটু ধেবড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেইমুহূর্তেই একটু চম্‌কে উঠতে হয়। লোকটা হঠাৎ উঠে বসেছে বলে মনে হচ্ছে: তা না হলে কম্বলটা হঠাৎ এভাবে হুমড়ি খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়বে কেন? সন্দেহ হয়; কট্‌কটে লোভের দৃষ্টিটা কাগজের আড়ালের এই আর্টের কীর্তিটা দেখবার চেষ্টা করেছে।

লোকটা কিছু দেখতে পেয়েছে কিনা, কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা কে জানে! কাগজটাকে ভাঁজ করে একপাশে ফেলে দিয়ে এইবার লোকটার দিকে তাকায় অপূর্ব। হ্যাঁ, ঠিকই, উঠে বসেছে লোকটা, আর, হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবছে।

কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না, লোকটা বাঙালী না অবাঙালী? গায়ে একটা গেঞ্জি; ভালো স্বাস্থ্যের চেহারাটা গেঞ্জির সঙ্গে আঁটসাঁট হয়ে যেন আরও সুঠাম হয়ে উঠেছে। গায়ের রং অবশ্য কালো, যদিও ঘোর কালো নয়। কপালের উপর পুরনো কাটার লম্বা একটা দাগ। ঘাড়ের দিকটা খুব মিহি করে ছাঁটা; কিন্তু মাথার উপরটা যেন কোঁকড়ানো চুলের জঙ্গল। তাও আবার এলোমেলো আর উসকো-খুসকো। ওভাবে একটা ভুটিয়া-কম্বলে মুখ ঢাকা দিয়ে ঘুমোলে, মাথার দশাটা এরকম জংলা হয়ে যাবেই তো।

এতক্ষণে চোখে পড়ে; নিকটে একটা টিফিন-কেরিয়ার আছে। কে জানে ওটার ভিতরে ছাতু আছে না গোস্ত-রুটি আছে? হয়তো চারখানা ফুলকো লুচি আর দুটি সন্দেশ আছে! কিন্তু এসবই অনুমানের সন্দেহ আর অনুমানের বিশ্বাস। খাবারের চেহারাটা চোখে পড়লে তবু হয়তো বুঝতে পারা যেত, লোকটা বাঙালী কিনা।

বেশ ভালো হয়, লোকটা যদি বাঙালী না হয়। বাংলাভাষা একটুও বুঝতে পারে না, একরকম বাঙালী হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। তা হলে, শুধু লোকটার কট্‌কটে দৃষ্টিটার সম্পর্কে একটু সাবধান থাকলেই চলবে; স্বামী-স্ত্রীর মনের কথা বলাবলি করতে অসুবিধা বোধ করবার কোন দরকারই হবে না।

শমিতা বলে,—সে-কথাটা মনে আছে তো?

অপূর্ব—কোন্ কথাটা?

শমিতা—পাহাড়ী নদীতে জল খাচ্ছে বুনো হরিণ; আমাকে একদিন দেখিয়ে দেবে বলেছিলে; মনে নেই?

অপূর্ব—খুব মনে আছে। কিন্তু···

শমিতা—কি?

অপূর্ব মুখ টিপে হাসে।—হরিণ দেখবার সাধটা খুব সুবিধের সাধ নয়; বেশ রিস্‌ক্ আছে।

শমিতা—দিনের বেলায় দেখবো, রাতের বেলায় নয়। সেটা রিস্‌ক্-এর ব্যাপার হবে কেন?

অপূর্ব—দিনের বেলাতেই না-হয় দেখলে। কিন্তু হরিণটা যদি একটা মায়ামৃগ-টৃগ হয়···তবে, শেষকালে সীতা-হরণের মতো একট ট্র্যাজেডি···

শমিতা—কলিযুগের সীতাদেবীরা বোকা নয়। কোন মায়ামৃগ-টৃগের সাধ্যি নেই যে চট্ করে এসে একটা ছলনায় ভুলিয়ে···

অপূর্ব—নিজের বুদ্ধির উপর তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে মনে হচ্ছে।

শমিতা—আছে বৈকি! তা না হলে তোমাকে বিয়ে করবো কেন?

অপূর্ব—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। ঠিক জবাব দেবে বল? মিথ্যে বলবে না?

শমিতা—কথাটা না শুনে এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না।

অপূর্ব হাসে—ঠিকই, স্বীকার করতে হচ্ছে, কলিযুগের সীতাদেবীদের বুদ্ধিটাও বেশ সাবধানী। যাই হোক···এবার সত্যি করে বল তো, বিয়ের আগে যখন প্রথম আমার কথা শুনলে, তখন কী মনে হয়েছিল?

শমিতা—মনে হয়েছিল, এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হতে পারে।

অপূর্ব—আরও একটু স্পষ্ট করে বল, ইচ্ছে হয়েছিল কিনা?

শমিতা—হয়েছিল বৈকি!

অপূর্ব—যদি আমাদের বিয়েটা না হতো? তবে?

শমিতা—তবে আবার কি?

অপূর্ব—অন্য কারও সঙ্গে তোমার বিয়ে হতো কিনা?

শমিতা—নিশ্চয় হতো।

অপূর্ব—সেই অন্য ভদ্রলোক যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করতেন, কোনদিন আর-কাউকে বিয়ে করবার ইচ্ছে তোমার হয়েছিল কিনা?

শমিতা—যদি জিজ্ঞেস করতেন, তবে জবাবও দিতাম।

অপূর্ব—কী জবাব দিতে, শুনি?

শমিতা—স্পষ্ট জবাব দিতাম।

অপূর্ব—সেই স্পষ্ট জবাবটা স্পষ্ট করে বলে দিলেই তো হয়।

শমিতা—স্পষ্ট বলে দিতাম,—না, কোনদিন কারও জন্যে ওরকম ইচ্ছে-টিচ্ছে হয়নি।

অপূর্ব—বাঃ! চমৎকার! সুন্দর!

শমিতা মুখ টিপে হাসে—কি?

অপূর্ব—এই চমৎকার ধূর্ততা! এই সুন্দর কূটবুদ্ধি!

শমিতা—যাই বল, সত্যি কথা বলে দিয়েছি।

অপূর্ব—তাহলে তো আমাকে এই বুঝতে হয় যে, তুমিও আমাকে ঠিক ওরকমই একটি সত্যিকথা বলে…

শমিতা ভ্রূভঙ্গী করে, চোখের চাহনিতে যেন একটা ধূর্ত বিদ্রোহ থমথম করে।—সন্দেহ করছো?

অপূর্ব—সন্দেহ নয়, একটা বাস্তবতাকে স্বীকার করতে চাইছি।

শমিতা—আমার গা ছুঁয়ে বল, সত্যি তোমার মনে এরকম কোন সন্দেহ আছে?

অপূর্ব—আঃ, তুমি যে সত্যিই সিরিয়াস হয়ে…কি আশ্চর্য, একটা সমান্য ঠাট্টার কথাতে এত রাগ করে…

হেসে ফেলে শমিতা।—তবে মিছিমিছি কেন যত আবোল-তাবোল প্রশ্ন ক'রে…

অপূর্ব—না, কোন প্রশ্ন নেই। কথাটা হচ্ছে, পাহাড়ী নদীর কাছে একটা নির্জনতার মধ্যে তুমি আর আমি গিয়ে দাঁড়ালে কোন হরিণ কি…

শমিতা—কি?

প্যাসেঞ্জার-লোকটার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে অপূর্ব বলে,—হরিণটা কি লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যাবে না?

শমিতা—ধেৎ, হরিণটা আবার লজ্জা পাবে কেন?

অপূর্ব—স্বামী-স্ত্রীতে গলা জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেয়ে……না হয় একটা বুনো হরিণই হলো, সে-বেচারাও কি বুঝতে পারবে না, যে,…

শমিতা—সাবধান, ওরকম বুনো কাণ্ড করলে আমি তোমার সঙ্গে কোনদিন বনে-টনে বেড়াতে যাব না।

অপূর্ব—মহুয়ামিলানের বন তুমি দেখনি, তাই সেই বনের মায়াও কল্পনা করতে পারছো না। সে-বনের ভিতরে ঢুকলে তোমার প্রাণটা নিজেই হরিণী হয়ে যাবার জন্যে ছটফট করবে, আর,

আমাকেও হরিণ মনে ক'রে···কবি কালিদাস মিথ্যেকথা লেখেনি, শমিতা।···

চমকে ওঠে অপূর্ব ; আর শমিতা যেন ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। কথা বলেছে প্যাসেঞ্জার লোকটা। একেবারে স্পষ্ট ও নিখুঁত বাংলাভাষায় একটা প্রশ্ন।--আপনারা কি মহুয়ামিলানে যাচ্ছেন ?

যাচ্ছেন ?—কথাটাকে বলবার ধরণের মধ্যে যেন নদীয়া জেলার টান আছে। এই টান অপূর্বর কানের অপরিচিত নয়। জীবনের তিনটি বছর অপূর্বকে যে কেষ্টনগরে থাকতে হয়েছিল। কেষ্টনগর কলেজে তিনটি বছর পার করে দিয়ে তারপর কলকাতায় চলে যেতে হয়েছিল। মনে হয়, এই ভদ্রলোকও বোধহয় কেষ্টনগরের লোক হবেন, যিনি নিতান্ত অভদ্রভাবে আচমকা একটা প্রশ্ন করে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ আলাপের আনন্দটাকে এরকম ভয়ানক একটা বাধা দিলেন।

অপূর্ব গম্ভীর স্বরে বলে,– হ্যাঁ ; মহুয়ামিলানে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক—আমিও।

অপূর্ব—কিন্তু আমি তো আপনাকে মহুয়ামিলানে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

—আজ্ঞে না, কেমন ক'রে দেখবেন ? আমি এই প্রথম যাচ্ছি।

—তাই বলুন।

—আপনি বোধহয় সেখানে অনেকদিন আছেন ?

—না, ঠিক অনেকদিন বলা যায় না। দু'বছর আগে মাস পাঁচেক ছিলাম। তারপর বদলি হয়ে এই আবার যাচ্ছি।

—কোথা থেকে বদ্‌লি হলেন ?

—চিত্রপুর থেকে।

—রেলওয়ের সার্ভিস বোধ হয় ?

—না। ফরেস্ট।

—তাই বলুন। আমার সন্দেহটা তাহলে নিতান্ত মিথ্যে নয় বোধহয়!

ভদ্রলোক যেন হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন; সারা মুখে একটা খুশির হাসিও ছড়িয়ে পড়েছে। অপূর্ব কিন্তু একটু বিরক্তভাবে প্রশ্ন করে,—বুঝলাম না। সন্দেহ-টন্দেহ কি-যেন বললেন?

—হ্যাঁ, আমার সন্দেহ, আমি আপনাকে চিনি। প্রথম দেখেও চেনা-চেনা মনে হয়েছিল

—আমি কিন্তু আপনাকে···

—হ্যাঁ, আপনার হয়তো কিছুই সন্দেহ হচ্ছে না। আমাকে চেনা-চেনা বলে আপনার মনে না হতেও পারে। সেটা অস্বাভাবিক নয়! অনেকদিন আগের, প্রায় কুড়িবছর আগের ব্যাপার কিনা!

—কী ব্যাপার?

—মনে হচ্ছে, আপনিই সেই অপূর্ব বসু, কুড়ি বছর আগে যার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল।

অপূর্বর চোখের দৃষ্টিটা এইবার যেন অগাধ বিস্ময়ের ভারে একেবারে অভিভূত হয়ে থমথম করতে থাকে। —আমার নামটা তো ঠিকই বললেন। চিনেছেনও ঠিক-ই। কিন্তু আমি যে কিছুই···

—আমি শান্তনু দত্ত। কুষ্টিয়ার সেই দত্তবাড়ির শান্তনু; যাদের বাড়িতে একটা বিলিতী আমড়ার গাছ ছিল, মনে পড়ে তো? বিলিতী আমড়া পাড়তে গিয়ে অপূর্ব যে একবার ডাল ভেঙে পড়ে গিয়েছিল, মাথায় চোট লেগেছিল; তারপর ডাক্তার এসে মাথার জখম ব্যাণ্ডেজ করে দিল। তার পর; দত্তবাড়ির এক জ্যেঠামশাই এসে শান্তনুকেই খড়মপেটা করলেন···মনে পড়ছে না? আমিই সেই শান্তনু।

—তুমি শান্তনু!—অপূর্ব উঠে দাঁড়ায়। তারপরেই যেন একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে শান্তনু দত্তের হাত চেপে ধরে।—তুমি শান্তনু। তুমি কোথা থেকে এতদিন পরে···কি আশ্চর্য···এ-যে স্বপ্নেও আশা

করতে পারা যায় না, শান্তনুর সঙ্গে এভাবে আমার আবার দেখা হতে পারে।

বিছানার উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটাকে হাতে তুলে নিয়ে শান্তনু বলে—নাও, একটা সিগারেট খাও, যদিও সন্দেহ হচ্ছে, সিগারেট বোধহয় তুমি ছেড়ে দিয়েছ।

শান্তনুর সিগারেট হাতে তুলে নিয়ে অপূর্ব বলে—প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। ওঃ, জ্যেঠামশাই-এর সেই ভয়ংকর খড়মবাজির দৃশ্য এখনও মনে পড়ে।

হ্যাঁ, এইবার সবই মনে পড়েছে অপূর্বর। কুড়ি বছর আগে, সেই ছেলেমানুষী জীবনের যত দুরন্ততার আনন্দে দুই বন্ধুতে মিলে কত অপরাধই না একসঙ্গে করা হয়েছে। সিগারেট খেয়েছে দুজনেই; দেখতে পেয়ে জ্যেঠামশাই কিন্তু শান্তনুকেই খড়ম-পেটা করেছেন। বিলিতী আমড়ার নরম আগডালে উঠতে অপূর্বকে বার বার নিষেধ করেছিল শান্তনু। কিন্তু শান্তনুর সে-নিষেধ অপূর্ব শোনেনি। ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে অপূর্বর মাথাটা যখন জখম হলো, তখন জ্যেঠামশাই-এর প্রচণ্ড খড়ম-পেটা আক্রোশ শান্তনুরই পিঠের উপর আছড়ে পড়লো।

তীর মেরে নন্দীদের পুকুরের একটা বোয়ালকে ঘায়েল করেছিল অপূর্ব। কিন্তু নন্দীমশাই দত্তবাড়িতে এসে শান্তনুর নামেই অভিযোগ দাখিল করে গেলেন। অভিযোগ অস্বীকার করেনি শান্তনু। জ্যেঠামশাই-এর খড়ম-পেটা আক্রোশের মার নীরবে সহ্য করেছে শান্তনু; কিন্তু ভুলেও মুখ খুলে বলেনি যে অপরাধটা অপূর্বর।

অপূর্ব যেন বিশবছর আগের সেই দুরন্তপনার স্মৃতিতে মনটাকে ডুবিয়ে বিহ্বল করে নিয়ে আস্তে আস্তে সিগারেট টানে ও ধোঁয়া ছাড়ে।

বেশ বিহ্বল স্বরেই অপূর্ব প্রশ্ন করে,—তুমিও মহুয়ামিলানে যাচ্ছ?

কি আশ্চর্য ; ভাবতেই যে আমার প্রাণটা দশবছর বয়সের একটা ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। ঘুড়ির সূতোর কড়া মাঞ্জার ফরমুলাটা মনে আছে তো শান্তনু ?

—চেষ্টা করলে মনে পড়েই যাবে। .

—কাচের গুঁড়ো, শিরিষের আঠা, বার্লির ক্বাথ আর···

—বার্লি আর হয় না। ভাতের মাড়ই যথেষ্ট।

—বেশ তো, মহুয়ামিলানেও সবই পাওয়া যাবে নিশ্চয়। শুধু শিরিষের আঠাটা···

—ডালটনগঞ্জ থেকে আনিয়ে নিলেই চলবে।

—হ্যাঁ ; লজ্জা-টজ্জা করলে চলবে না শান্তনু, মাঝে মাঝে ঘুড়ি ওড়াতেই হবে। তা ছাড়া, সময়টা কাটবেই বা কেমন করে বল ?

—ঠিক কথা ; নন্দীদের পুকুর নেই, বিলিতী আমড়ার গাছও নেই যখন, তখন।

—আঃ, আসল কথাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছি। তুমি মহুয়ামিলানে কেন ? কিসের কাজ ?

—একটা সাব-কণ্ট্রাক্টের কাজ। মুরির মেটাল-কারখানার জন্যে দু'তিন রকম পাথর সাপ্লাই করবার কাজ। তিনটে পাহাড় ইজারা নিয়েছি। কিছু লোকজনও রেখেছি। শুধু পাথর ব্লাস্ট করা, টুকরো পাথরের গাদা গরুর গাড়িতে বোঝাই করে রেলস্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। বাস্ তারপর আমার আর কোন দায়িত্ব নেই। কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে চুক্তি, প্রতি টনে পাঁচ টাকা আমার প্রাপ্য হবে।

—এতদিন ধরে কি এসবই করছিলে ?

—পাঁচ বছর ধরে এ-কাজই করছি। এতদিন ছিলাম সিংভূমে। এবার এদিকে এগিয়ে আসতে হলো। ভালো বক্সাইট এদিকের পাহাড়েই ভালো পাওয়া যায়।···তবে জিজ্ঞেস করতে পার ; এত জায়গা থাকতে মহুয়ামিলানে ডেরা বাঁধবার কথা কেন মনে হলো ?

—হ্যাঁ ; আমার তো মনে হয়, তোমার কাজের জন্যে টোরিতে ডেরা বাঁধলেই বেশি সুবিধে হতো।

—কাজের সুবিধে হয়তো হতো ; কিন্তু মহুয়ামিলানের জলের মতো ভালো জল তো অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। শুনেছি মহুয়ামিলানের জলে একবছরে শরীরের ওজন দশ সের বাড়িয়ে দেয়।

—তোমার আর ওজন বাড়িয়ে কাজ নেই। গেঞ্জিটা তো ফেটেই যাবে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

ঝরণার জলের কলকল স্বরের ঝলকের মতো একঝলক হাসির শব্দ। হেসে ফেলেছে শমিতা। এরকম একটা কলহাস্যের উৎস যে এতক্ষণ ধরে নীরব হয়ে দুই বন্ধুর দুরন্ত আনন্দের কথাগুলিকে শুনছে, দুই বন্ধু যেন এই সত্যতা ভুলেই গিয়েছিল।

অপূর্ব আর শান্তনু, দুজনে একসঙ্গেই মুখ ফিরিয়ে শমিতার দিকে তাকায়। কিন্তু শমিতা মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। আচমকা হেসে ফেলে শমিতা যেন তার মনের খুশির ভাবটাকেই আচমকা ধরা-পড়িয়ে দিয়েছে। যে গল্পের সঙ্গে শমিতার কোন সম্পর্ক নেই, সেই গল্প-কেই এতক্ষণ ধরে লোভীর মতো উৎসুক হয়ে শুনছিল শমিতা। হাসিটা শমিতার এই লোভী উৎসাহটাকে লজ্জা দিয়ে অপ্রস্তুত করে দিয়েছে। মুখটা লুকোতে গিয়ে শমিতা যেন একটা লজ্জাবিব্রত মন লুকোতে চেষ্টা করে।

শমিতারই দিকে তাকিয়ে শান্তনু হাসে।—আপনি মিছে মুখ লুকোতে চেষ্টা করছেন। অপূর্বর জীবনসঙ্গিনীর মুখটা আমি আগেই দেখে ফেলেছি।

অপূর্বও হাসে।—এই মাত্র সাত মাস হলো উনি দয়া ক'রে আমার জীবনসঙ্গিনী হয়েছেন।

শমিতা এইবার মুখ ফিরিয়ে অপূর্বর দিকে ভ্রূভঙ্গী ক'রে তাকায়

চোখ-দুটো কিন্তু বেশ দীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করতে গিয়ে গলার স্বরে একটুও লজ্জাময় জড়তার বাধা অনুভব করে না। —দয়া মানে ?

অপূর্ব—দয়া মানে এই যে, অন্য অনেক ভালো পাত্র থাকতেও তুমি আমার মতো একজন জঙ্গল-মানবকে বিয়ে করেছ।

শান্তনু এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। কিন্তু শমিতা এইবার ভ্রূভঙ্গীটা শান্তনুরই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে, আর গলার স্বরে যেন একটা মিষ্টি ঝাঁজ মিশিয়ে দিয়ে কথা বলে.—আপনি কিন্তু খুব ভুল বুঝে হাসছেন।

শান্তনু—কেন ?

শমিতা—আপনার বন্ধু যে তাঁর নিজের দয়ার কথাটিকেই একটু কায়দা করে বলেছেন, সেটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেননি !

শান্তনু—সত্যিই বুঝতে পারিনি।

শমিতা—এক গরীব ক্তারের মেয়ের বিয়েই হচ্ছিল না। আপনার বন্ধু তাই দয়া করে সেই ডাক্তারকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছেন।

শান্তনু—বুঝলাম ; আপনারা দুজনেই দুজনকে দয়া করেছেন। খুব ভালো করেছেন। চমৎকার ব্যাপার হয়েছে।

অপূর্ব এইবার শান্তনুর মুখের উল্লাসটাকে যেন বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে,—এইবার তুমি বল, তোমাকে যিনি দয়া করেছেন, তিনি কোথায় ?

শমিতা হেসে ওঠে। —হ্যাঁ, আসল কথাটা চাপা দিচ্ছেন কেন ? আপনি যাকে দয়া করলেন, তাঁকে কোথায় রেখে এলেন ?

শান্তনু—আপনাদের অনুমান নিতান্ত ভুল। আমাকে এখনও কেউ দয়া করেনি।

অপূর্ব—কেন ?

শান্তনু—আমি দয়ার যোগ্য নই বলে।

শমিতা—এটা কি একটা কথা হলো!

অপূর্ব—সত্যি, বড় ভালো হতো শান্তনু, যদি…

শান্তনু—তা তো বটেই… কিন্তু…

শমিতা—কিন্তু মানে, ক্ষতি হলো আমার।

শান্তনু—কেন?

শমিতা—আপনারা তো বেশ দুই বন্ধুতে মিলে মহুয়ামিলানের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী নদীর জল খাবেন আর তিতির মারবেন আর ওজন বাড়াবেন; কিন্তু আমার দশাটা কি হবে ভেবে দেখুন? মনের মতো একটি বান্ধবী থাকলে…

শান্তনু—ঠিকই বলেছেন; আপনারই সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হবার কথা। মন খুলে দুটো কথা বলবার মতো একজন মানুষকে কাছে না পেলে…

অপূর্ব—কেন? আমি কিসের জন্যে রয়েছি? আমি কি মানুষ নই?

শমিতা—তুমি হলে ভয়ানক মানুষ, যার সঙ্গে মন খুলে সব কথা বলা চলে না।

অপূর্ব—কিন্তু, এইতো মাত্র তিন ঘণ্টা আগে, মুরিতে ওয়েটিং-রুমেতে তুমিই না আমার কানের কাছে ফিসফিস করলে…

শমিতা—চুপ কর!

অপূর্ব—চুপ করে থাকলে নিতান্ত একটা মিথ্যাকে সহ্য করা হবে।…তুমি শুনে আশ্চর্য হবে শান্তনু, এই কিছুক্ষণ আগে উনি নিজেই বাখান করে বলেছেন, মহুয়ামিলানের নিরিবিলি জীবনে সকাল-সন্ধ্যা শুধু আমরা দুজনে…

শমিতা—চুপ কর!

শান্তনু হাসে।—চুপ করাই ভালো, অপূর্ব। কথা চেপে যাও।

শমিতা—কিন্তু সেজন্যে আপনি রেহাই পাচ্ছেন না।

শান্তনু—আমার অপরাধ ?

শমিতা—আপনি কথা দিন, আর দেরি করবেন না।

শান্তনু—কী কথা ?

শমিতা—সোজা কথা। এইবার খুব শিগ্‌গির বিয়ে করবেন। আমাকে একটি বান্ধবী এনে দেবেন।

শান্তনু—কথা দিতে পারি। কিন্তু জানবেন, শেষে নিশ্চয়ই মিথ্যুক প্রমাণিত হব। আমার কথার উপর নির্ভর করে কিছু আশা করলে শেষে হতাশ হতে হবে।

শমিতা—আপনি ছুতো ক'রে দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন।

শান্তনু—তার চেয়ে আপনিই কথা দিন না ?

শমিতার স্নিগ্ধ চোখের দীপ্তিটা হঠাৎ চমকে ওঠে।—আমি আবার কি কথা দিতে পারি ?

শান্তনু—কথা দিন, আপনিই খোঁজখবর করে আপনার একটি বান্ধবীকে আনবার ব্যবস্থা করবেন।

শমিতা খুশি হয়ে হাসে।—তা যদি বলেন, তবে এখনই কথা দিতে পারি। কলকাতার চারুমাসীকে একটি চিঠি দিলে সাতদিনের মধ্যে তিনি দশটি ভালো মেয়ের সন্ধান জানিয়ে দেবেন।

শান্তনু—তাহলে চারুমাসীকে একটা চিঠি লিখেই ফেলুন। আর দেরি করবেন না!

শমিতা—আপনিও বলুন তাহলে···

শান্তনু—আবার কি বলতে হবে ?

শমিতা—কি-ধরণের মেয়ে হলে ভালো হয়।

শান্তনু—এতই যদি বলতে পারতাম, তবে কি আর এতদিনে···

শমিতা—ওসব কথা ছাড়ুন। আসল কথাটা বলুন।··· নিশ্চয় খুব শিক্ষিত মেয়ে হলে খুব ভালো হয়।

শান্তনু—কি করে বলি? শিক্ষিত মেয়ে মানেই বা যে কী বস্তু, তাও বুঝতে পারি না।

অপূর্ব—খুব শিক্ষিত মেয়ের দরকার কি? কি বল শান্তনু?

শমিতা—আঃ, তুমি কেন মাঝখানে পড়ে…। শান্তনুবাবুকে বলতে দাও।

অপূর্ব—বলুক শান্তনু। কিন্তু…

শমিতা—তুমি চুপ কর। তুমি একটা অর্ধশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করেছ বলে সকলেই যে…

অপূর্ব—হ্যাঁ, সেইজন্যেই বলছি, অর্ধশিক্ষিতেই বা আপত্তি করবার কি আছে?

শান্তনু—তোমরা দুজনে মিলে তর্ক-বিতর্ক ক'রে শুধু আমার বিপদটা বাড়িয়ে তুলছো। চেষ্টা করে যেটুকু বলতে পারতাম, তাও সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয়; অগত্যা…

অপূর্ব—কি?

শান্তনু—উনিই লিখে দিন, উনি যা ভালো বোঝেন।

অপূর্ব—তার মানে?

শান্তনু—ভালো মেয়ে বলতে উনি যা বোঝেন, তাই।

অপূর্ব—উনি তো শুধু বোঝেন যে, উনিই হলেন একটি মডেল ভালো-মেয়ে।

শান্তনু—তাই যদি বুঝে থাকেন তো বুঝেছেন, ভালোই বুঝেছেন।

অপূর্ব—শুনলে তো শমিতা, বাস্, তবে তো আর কোন প্রশ্নই নেই। চারুমাসীকে লিখে দাও যে, শান্তনুর জন্য ঠিক তোমার মতো ভালো একটি পাত্রী চাই।

—ছিঃ; প্রতিবাদ করতে গিয়ে শমিতার গলার স্বর যেন কুণ্ঠিত হয়ে যায়। শমিতার মুখের উৎসাহটা হঠাৎ লজ্জা পেয়েছে। শমিতার মাথাটাও যেন একটু হেঁট হয়ে যায়।

অপূর্বর কথাগুলির উপর একটু রাগও হয় বোধহয় ; তা না হলে শমিতার নরম ভ্রূভঙ্গীটা একটু শক্ত হয়ে উঠবেই বা কেন ? অপূর্বর কোন কাণ্ডাকাণ্ডি বোধও নেই। তা না হলে নিজের স্ত্রীর নামে এরকম একটা স্তুতির কথা এত চেঁচিয়ে বলে দিতে পারতো না। তা ছাড়া, মনে এটুকু সন্দেহও নেই যে, এমন স্তুতির কথাটা তার বন্ধুর কাছে নিতান্ত একটা বাজে-কথা বলে মনে হতে পারে। নিজের জীবনের পছন্দটাকে বন্ধুর জীবনের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টাটা যে দেখতে কত খারাপ, সেটুকু বোঝবারও কোন চেষ্টার ধার ধারে না মানুষটা।

রুমাল দিয়ে কপালটাকে এবার মুছে নিয়ে শমিতা যেন মনের ভেতরের একটা অস্বস্তিকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে। একটা সন্দেহময় অস্বস্তি। অপূর্বর বাজেকথাগুলি শান্তনুবাবুকে বেশ বিপদে ফেলেছে। নিতান্ত চক্ষুলজ্জার জন্যে স্পষ্ট ক'রে 'না' বলতে পারছেন না। শমিতার মতো মেয়ে শান্তনুবাবুরও পছন্দের চোখে ভালো মেয়ে বলে মনে হবে, এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া, শান্তনুবাবু তাঁর জীবনের সাধ-অসাধের কথাটাকে যতই তুচ্ছ করে বলুননা কেন, কে জানে তার পেছনে অন্য কোন সত্য আছে কি নেই ? জীবনের ইচ্ছাটাকে নিতান্ত একটা শূন্যতা বলে বড় গল্প করে প্রচার করেছেন বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে যে, ভদ্রলোকের ইচ্ছার ঘরে কোন ছবি নেই ; কারও ছবি নেই ?

কিন্তু, কী আশ্চর্য, সত্যিই শমিতার মনের অশ্বস্তিটা এইবার যেন একটু আশ্চর্যের ভারে ভারী হয়ে, অদ্ভুত একটা ভয়ের মতো অনুভব হয়ে ছমছম করতে থাকে। কোন কথা বলছেন না শান্তনুবাবু। যেন একটা ভাবনায় পড়েছেন। ভাবতে গিয়ে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছেন। লজ্জাটাও বোধহয় বেশ অসুবিধেয় পড়েছে। স্পষ্ট করে 'না' বলে দিলে বন্ধুর স্ত্রী বেচারাকে একটু অপমান করা হবে ; বোধহয় সেইজন্যেই এই কুণ্ঠিত নীরবতা।

কিন্তু স্পষ্ট করে 'হ্যাঁ' বলে দিলে যে সেটা ভয়ানক একটা অভদ্র উৎসাহের ঘোষণার মতো বিশ্রী শব্দ করে বেজে উঠবে। শমিতা যেমন ভালো, ঠিক তেমন ভালো একটি মেয়ে শান্তনুর জীবনের সঙ্গিনী হলে ভালো হয়; হয়তো সত্যিই ভালো হয়। কিন্তু সে-কথা স্পষ্ট করে বলে ফেললে যে শমিতারই রূপ-গুণের উদ্দেশ্যে একটা নির্লজ্জ জয়ধ্বনি করা হয়। শান্তনুবাবুরও কোন কাণ্ডাকাণ্ডি বোধ নেই, এতটা সন্দেহ করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু, আশ্চর্য হতে হয়, কেন চুপ করে রয়েছেন শান্তনুবাবু?

তা ছাড়া, অনুরোধের কথার উপর একটা সাধারণ ভদ্রতার আবরণও তো থাকা উচিত। কোন মহিলার আড়ালে যে-কথা অন্য কাউকে বলা চলে, সে-কথা একেবারে মহিলারই কাছে বলে ফেলা কোন ভদ্রলোকের পক্ষে উচিত নয়; শোভনও নয়। বন্ধু নিশ্চয়ই বন্ধু; তার কাছে দু'চারটে মাত্রাছাড়া কথা বলতে পারা যায়; বলাই নিয়ম। কিন্তু বন্ধুর স্ত্রী-মাত্রই বান্ধবী নয়; এবং তার সঙ্গে কোন মাত্রাছাড়া কথা চলে না, সেটা নিয়মও নয়।

তার চেয়ে ভালো, অপূর্বর পছন্দের কথাটাকে বাধা দিয়ে আর তুচ্ছ করে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিক শান্তনু, না, ওরকম কথা লিখে লাভ নেই। ঠিক শমিতার মতো ভালো মেয়ে না হলেও চলবে। আরও কতরকমের ভালো মেয়ে তো পৃথিবীতে আছে।

কামরার জানালার কাচের গা ছুঁয়ে যেন কতগুলি টুকরো-টুকরো আগুনের হাসি ছুটে চলে গেল। বোধহয় একটা ছোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একসারি ল্যাম্পপোস্টের দীপ্ত মাথাগুলির চকিত উধাও ছবি। ট্রেনটা এই স্টেশনে থামলো না, তাই···তাইতেই বা শমিতার মনটা এভাবে চম্‌কে উঠবে কেন?

জানালার কাচের উপর টুকরো-টুকরো জ্বলন্ত হাসির ছুটন্ত ছবি শমিতার চোখ ধাঁধিয়েছে, সে জন্যে নয়। কথা বলেছে শান্তনু।

—তবে তাই লিখে দিন, যেন হুবহু আপনারই মতো একটি পাত্রীর খোঁজ করেন কলকাতার মাসীমা।

শান্তনুর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার অন্যদিকে চোখ ফেরায় শমিতা। ঠিকই, যা সন্দেহ করেছিল শমিতা, তাই। শান্তনু শমিতারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শান্তনুর এই দুই চোখের চাহনিতে কোন লজ্জা ও সঙ্কোচের ছায়াটুকুও নেই; বরং যেন নিজেরই এই অনুরোধের একটা প্রতিধ্বনি শোনবার আশায় পিপাসিতের মতো তাকিয়ে আছেন শান্তনুবাবু, শমিতার স্বামী অপূর্বর ছেলেবেলার বন্ধু এই ভদ্রলোক।

অপূর্বর মতো সরল মনের মানুষের একটা হঠাৎ উৎসাহের ছেলেমানুষিপনার খুব সুযোগ নিলেন এই ভদ্রলোক। অকপট বন্ধুত্বের একটা পরিহাসপ্রিয় উল্লাসকে বেশ কাজে লাগিয়ে নিলেন; তা না হলে এরকম একটা কথা বলেও ওভাবে তাকিয়ে থাকবার সাহস পেতেন না ভদ্রলোক।

শমিতার মৃদু ভ্রূকুটির মধ্যেও যেন একটা বিরক্ত অস্বস্তির ভাব কঠোর হয়ে ফুটে উঠতে থাকে। ভদ্রলোককে বেশ একটু অভদ্র বলেই মনে হচ্ছে। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার সাধারণ নিয়মটুকুও জানেন না। বোধ হয়, কোন মহিলারই সঙ্গে কথা বলতে জানেন না। আর, সেজন্যেই বোধ হয়, আজও একা একা পাহাড়ে-জঙ্গলে শুধু পাথর ফাটিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

বুঝতে পারে শমিতা, শান্তনুর এরকম একটা চেঁচিয়ে বলা অনুরোধের কথা শুনে এভাবে স্তব্ধ হয়ে যাওয়াও ভালো দেখাচ্ছে না। শমিতার মনের যত অস্বস্তি আর সন্দেহগুলিও যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু উত্তর দেবার মতো কোন কথাও যে মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কথা বলতে চেষ্টা করলেই যেন একটা বেশ বিশ্রী ও শক্ত কথা

মুখের কাছে এগিয়ে আসতে চায়। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। স্বামীর বন্ধু এই ভদ্রলোকের যদি বিন্দুমাত্রও কাণ্ডজ্ঞান আর বুদ্ধি থাকে, তবে বুঝে নিতে পারবেন যে, ওরকম অনুরোধ করা উচিত হয়নি।

বোধ হয় এরই মধ্যে ভুল বুঝে ফেলেছেন ভদ্রলোক। শান্তনুর চোখের চাহনিটা বোধ হয় শমিতার এই নিরুত্তর স্তব্ধতার মূর্তিটাকে কি-যেন সন্দেহ ক'রে একটু সাবধান হয়ে গিয়েছে। তা না হলে···

হ্যাঁ, খুব চেষ্টা ক'রে, চোখ-মুখের অস্বস্তির আর অপ্রসন্নতার চেহারাটাকে একটু হাসিয়ে নিয়ে, আর বোধ হয় অন্য কোন কথা বলে ঘটনার ভার একটু হালকা করে দেবার জন্য শান্তনুর দিকে তাকায় শমিতা। দেখতে পায় শমিতা, একটা সিগারেট ধরিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে যেন সিগারেটেরই ধোঁয়ার খেলা দেখছেন শান্তনুবাবু। যেন এরই মধ্যে একেবারে ভুলে গিয়েছেন যে, এইমাত্র নিজেরই জীবনের একটা দাবির কথা ঘোষণা করেছেন। সে-দাবির পরিণাম কি হলো বা না হলো, সেজন্য আর যেন কোন কৌতূহল নেই। এরই মধ্যে, নিজেরই অনুরোধের কথা দিয়ে গড়া একটা ঘটনার ছোঁয়া থেকে যেন অনেক দূরে সরে গিয়ে একেবারে শান্ত ও উদাস বিবাগী মানুষটির মতো চুপ করে বসে আছেন ভদ্রলোক।

এইবার শমিতার চোখের দৃষ্টিটাই অপ্রস্তুত হয়। যেন নিজেরই চিন্তার রকম-সকম দেখে একটা লজ্জা পেয়েছে শমিতা। সামান্য একটা কথাকে এত বড় করে ভাববার কোন দরকার ছিল না। শান্তনুবাবু শুধু একটা কথার কথা মাত্র বলেছেন; নিতান্ত একটা হাসির কথা। সে-কথা শুনে শমিতারও হেসে ফেলাই উচিত ছিল।

কথা বলে অপূর্ব। —তোমার সঙ্গে তো জিনিষপত্র কিছু দেখছি না, শান্তনু।

শান্তনু—সব আগেই চলে গিয়েছে।

অপূর্ব—সুবিধামতো একটা বাসা কিংবা ঘর-টর পেয়েছ তো? মহুয়ামিলানে তো বলতে গেলে, রায়বাবুর দু'খানি বাংলো আর নিয়োগীদের একটা মেটে-বাড়ি, এ ছাড়া ভাড়া নেবার মতো কোন…

চেঁচিয়ে ওঠে শান্তনু—ওসব কোন নেশাই আমার নেই। ঘর-টর কি আমার পোষায়?

অপূর্ব—তার মানে?

—ঘর-টর নয়, তাঁবু।

—তার মানেই বা কি?

—মহুয়ামিলান স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে জয়গড়ের শালবনের কাছে আমার তাঁবু ফেলা হয়েছে।

—তাঁবুতেই থাকা হচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শুধু তাঁবুতেই…

—হ্যাঁ, বছরের পর বছর তাঁবুতেই পার করে দিয়ে আসছি। কোন অসুবিধে নেই।

—সুবিধেই বা কি?

—সুবিধে এই যে, ইচ্ছে হলেই দু'ঘণ্টার মধ্যে তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ি; আর অন্য কোথাও গিয়ে ডেরা বাঁধি।

—যাযাবর জীবন?

—হয়তো তাই; কিন্তু আরও একটা সুবিধা আছে।

—কি?

—কোন মায়াচক্রে পড়তে হয় না।

—তার মানেই বা কি?

—কোন জায়গাকে চিরকালের বলে মনে ক'রে ফেলবার ভয় নেই। তার মানে, সে-ভয় দেখা দেবার আগেই সরে পড়তে পারি।

—তাতেই বা কী লাভ হচ্ছে ?

—ক্ষতিও কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না।

—ক্ষতিটা বুঝতেই পার না।

—তাহলে তো বেশ লাভই হয়েছে বলতে হবে।

নিজেরই জীবনের একটা কৃতিত্বের গর্বে যেন উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে হাসতে থাকে শান্তনু। অপূর্বও হাসে। কিন্তু শমিতার মুখের হাসিটা হঠাৎ যেন করুণ হয়ে যায়।

ঘর নেই, ঘরের জন্য কোন লোভও নেই, শুধু পাহাড়, বন আর ঝরণা-নদীর আশেপাশে ও আনাচে-কানাচে একটা তাঁবুর ভিতরে, একটা নিঃসঙ্গ রিক্ততার মধ্যে পড়ে থাকতে ভালবাসেন ভদ্রলোক। এবং সেই রিক্ততারই জন্য কত গর্ব! শান্তনুবাবুর এই চেঁচিয়ে-হাসা উল্লাস যেন অপূর্ব আর শমিতার ঘরোয়া সুখের গর্বটাকে ঠাট্টা করছে, তুচ্ছ করছে। কোন ভুল নেই, কলকাতায় মাসীমাকে শুধু একটা ঠাট্টার কথা লিখে জানাবার জন্য অনুরোধ করেছেন শান্তনুবাবু। ওটা অনুরোধই নয়!

অপূর্ব বলে—তাহলে কলকাতার মাসীকে ওসব কথা লিখে কোন লাভ নেই, শমিতা।

শান্তনুর কান-দুটো যেন চমকে উঠেছে। শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দূরবীনের চোখের মতো সুস্থির চাহনি তুলে, কি-যেন দেখতে চেষ্টা করে শান্তনু।

অপূর্ব তার নিজের মনের আবেগে বলেই যেতে থাকে। —গৃহ নেই যার, তার অদৃষ্টে গৃহিণী জুটবে কেমন করে ?

শমিতা—উনি গৃহ ভালবাসেন না, তাই গৃহিণী জোটে না।

অপূর্ব—বেশ তো, তাঁবু ভালবাসেন যখন, তখন একটি...

শমিতা—কি ?

অপূর্ব—অন্তত একটি তাঁবুনী তো জুটতে পারে ?

—চুপ কর। হাসতে গিয়ে অপূর্বর মাত্রা ছাড়া ঠাট্টাটার বিরুদ্ধে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি হেনে শমিতা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

শান্তনু বলে—ওঁর নামটা·· কি-যেন শুনলাম। শমিতা?

অপূর্ব—হ্যাঁ।

শান্তনু—আমি কিন্তু একজন শমিতাকে জানি। অনেকদিন আগের কথা···সে প্রায় দশ বছর আগেকার চেনা একটি মেয়ে।

অপূর্ব—ক'বছর বয়সের মেয়ে?

শান্তনু—তা বছর দশ-বারো হবে।

অপূর্ব—আজ তিনি তাহলে এঁরই মতো বাইশ বছর বয়সের···

শমিতা—না, আমার বয়স বাইশ বছর নয়।

অপূর্ব—কুড়ি।

শমিতা—বলবো না।

অপূর্ব—তবে চব্বিশ।

শমিতা—যা খুশি বলতে পার।

শান্তনু—আমার জেঠতুতো দাদার ভায়রা; যিনি গোমেতে ডাক্তার ছিলেন, তাঁদেরই বাড়িতে···

অপূর্ব—এ-যে সত্যিই মিলে যাচ্ছে। শমিতার বাবাও ডাক্তার।

শান্তনু—রেলওয়ের ডাক্তার নন্দবাবু।

শমিতা চম্‌কে ওঠে, চোখ বড় ক'রে তাকায়। কি আশ্চর্য; আপনি যে আমার বাবারই নাম করলেন।

শান্তনু হাসে। —গোমোতো, নন্দবাবুর বাড়িতে প্রায় তিন মাস ছিলাম। তাঁরই মেয়ে শমিতা, দশ-বারো বছর বয়সই হবে, আমি ডাকতাম 'শমি'।

শমিতা—আমার কিন্তু আপনাকে একটুও মনে পড়ছে না, শান্তনুবাবু।

শান্তনু—আমাকে মনে না-পড়বারই কথা। কিন্তু একজন সাধু'দাকে মনে পড়ে কি ?

—সাধুদা ? হ্যাঁ, একজন সাধুদা আমাদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। গেরুয়া পরতেন, মাথাটা নেড়া ছিল।

—হ্যাঁ, বেচারা একটা স্বদেশী মামলার ফেরারী আসামী ছিল। পুলিশের হুলিয়ার ভয়ে সাধু সেজে গোমেতে এসে নন্দবাবুর বাড়িতে কিছুদিন লুকিয়ে ছিল।

—তা জানি না ; কিন্তু সাধুদাকে মনে পড়ে।

—ধানবাদের ঘটনাও কি মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ, এখনও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। আরও কতবার মনে পড়েছে। যখনই মনে পড়েছে, তখনই চোখে জল এসেছে।

অপূর্ব ব্যস্তভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলে—বাঃ, এ যে একেবারে রোমাঞ্চকর একটা ডিটেকটিভ কাহিনীর মতো…

শমিতা—মোটেই নয়।

অপূর্ব—তবে ?

শমিতা—ধানবাদে সেই প্রথম এসেছিল জার্মানির তৈরী ইঞ্জিনটা, যার নাম 'প্রিন্সেস কালকা'। পাড়ার কত ছেলেমেয়ে প্রিন্সেস কালকা দেখবার জন্য ধানবাদে গেল, কিন্তু আমাদের কেউ নিয়ে যাবার ছিল না। বাবার সময় ছিল না। চাকর রামদুলালটাও ছিল রাতকানা। ওর সঙ্গে আমাদের তিন ভাইবোনকে ধানবাদে পাঠাতে বাবা রাজী-ই হলেন না। আমি তো একেবারে কান্না জুড়েই দিলাম।

অপূর্ব—তারপর ?

শমিতা—তারপর সাধুদা-ই এগিয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি চল।

অপূর্ব—সাধুদা'র সঙ্গে তোমরা ধানবাদে গিয়েছিলে, বাস্, এই তো ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এর মধ্যে এমন কি ছিল, যে-জন্যে চোখে এত জল-টল…

—ধানবাদে আমরা 'প্রিন্সেস কালকাকে' দেখলাম। সাহেবদের ছেলেমেয়েগুলির মতো আমরাও প্রিন্সের কালকার গায়ের উপর ফুল ছুঁড়লাম, তারপরেই…

শমিতার চোখ-ছুটো সত্যিই ছলছল করে ওঠে। —তারপরেই দেখি ছুজন পুলিশ সাধুদা'র হাত চেপে ধরেছে।

শান্তনু হো-হো করে হেসে ওঠে। —সে একটা দিন ছিল বটে!

শমিতা—বিশ্রী কষ্টের দিন। পুলিশ সাধুদা'র হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। কোমরে দড়ি বাঁধলো। সাধুদা কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

অপূর্ব—কিছু বলেননি?

শমিতা—হ্যাঁ, বললেন, তোমরা পরের ট্রেনেই গোমো চলে যেয়ো, শমি; আর বাবা ও মাকে শুধু বলবে যে, সাধুদা শ্রীঘরে চলে গেলেন।

শান্তনু গা-মোড়া দিয়ে আর হাই তুলে আবার হাসতে থাকে। —হ্যাঁ, ঘর বলতে আমার শুধু সেই শ্রীঘরের অভিজ্ঞতা আছে। তিনটে বছর বেশ ভালোই কেটেছিল। তারপর থেকে আর কোন ঘর নয়।

চেঁচিয়ে ওঠে শমিতা—কি বললেন?…আপনি…হ্যাঁ,….এই তো …এবার বেশ চিনতে পারছি, আপনিই যে আমাদের সেই সাধুদা।

শান্তনু—হ্যাঁ। আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই একটু সন্দেহ করেছিলাম যে…

শমিতা—এখন আর আমাকে 'আপনি' ক'রে না বললেও চলবে। ভাবতে অদ্ভুত লাগছে। আপনার সঙ্গে সত্যিই আবার যে এভাবে দেখা হয়ে যাবে, কখনো কল্পনাও করতে পারিনি।

শান্তনু—কিন্তু, আপনারা কেউ কি কখনো আমার খোঁজ করেছিলেন ?

শমিতা—নিশ্চয় খোঁজ করেছিলাম। বাবা কতবার আপনার জেঠতুতো দাদার কাছে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু জানিয়েছিলেন যে, আপনার কোন খোঁজ-খবর কেউ জানে না। আপনার বাড়িরও কেউ জানে না।

শান্তনু—বাড়ির মানুষ বলতে তো একমাত্র মা।

শমিতা—তিনি এখন কোথায় আছেন ?

শান্তনু—এখন আর কোথাও নেই।

বরকাকানা। কুলীদের হাঁক-ডাক শোনা যায়। শেষরাত্রির কুয়াশা যেন নিজেরই ঘুম ভেঙে দিয়ে স্টেশনের নাম হাঁকছে। অনেকক্ষণ আগেই মন্থর হয়ে গিয়েছিল ট্রেনটা। এইবার থেমেই গেল। জানলার কাচ তুলে দিয়ে অপূর্বও হাঁক দেয়,—চা-ওয়ালা, এই গরম চা-ওয়ালা ?

শান্তনু বলে—আপাতত আমার গন্তব্য এই পর্যন্ত। আমি এখন নামবো।

শমিতা—এখানে কেন ? আপনি কি মহুয়ামিলানে যাচ্ছেন না ?

শান্তনু—মহুয়ামিলানেই যাচ্ছি। এখন এখানে নেমে একবার খোঁজ করতে হবে, আমার ডিনামাইটের চালানটা পৌঁছেছে কিনা।

ভুটিয়া-কম্বল গায়ে জড়িয়ে আর টিফিন-কেরিয়ারটা হাতে তুলে নিয়ে শান্তনু হাসে। —আসি তাহলে।

কামরা থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে অপূর্বর দিকে তাকায় শান্তনু। —এখানে দাঁড়িয়ে শুধু হাঁক দিলেই গরম চা কাছে এসে পড়বে না, অপূর্ব।

অপূর্ব—তবে কি করতে হবে ?

শান্তনু—কিছু করতে হবে না ; তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ওঁর সঙ্গে গল্প কর। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

অপূর্ব—তুমি তো তোমার ডিনামাইটের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছ।

শান্তনু—তার আগেই···দেখি···চায়ের স্টল-ওয়ালার ঘুম ভাঙিয়ে যদি···

চলে যায় শান্তনু।

॥ দুই ॥

সত্যিই, শেষে একদিন একটা হরিণকে দেখতে পাওয়া গেল। আমলকীর ঝোপের পাশে লুকিয়ে ছিল হরিণটা। অপূর্ব আর শমিতার পায়ের শব্দ শুনেই চম্‌কে উঠে একটা দৌড় দিল। ছোট নদীর বালিয়াড়ি তিন লাফে পার হয়ে শালবনের ভিড়ের ভিতরে উধাও হয়ে গেল হরিণটা।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। দূরের পাহাড়ের মাথায় তখনও ক্লান্ত সূর্যের রঙীন আভা লুটিয়ে আছে। হরিণটাকে তাই বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। টানা-টানা চোখ, শিঙের সঙ্গে একটা ছেঁড়া লতা জড়িয়ে রয়েছে। সুন্দর একটা ছুটন্ত মায়ার ছবি যেন শালবনের ভিতরে লুকিয়ে পড়লো।

অপূর্ব খুশি হয়ে হাসে।—দেখলে তো, মায়া-হরিণ-টরিণ নয়, একেবারে খাঁটি একটা চিতল-হরিণ; অন্তত বারো সের মাংস হবে।

শমিতা—মায়াহরিণ হলেই বা···

অপূর্ব—কি বললে?

শমিতা—আচ্ছা, তোমার সেই বন্ধু ভদ্রলোক, সেই শান্তনুবাবু কোথায় গেলেন?

অপূর্ব—ঠিক কোথায় যে আছে, তা জানি না। তবে শুনেছি, এখন টৌরির কাছে একটা জঙ্গলের ভেতরে তাঁবু করেছে।

শমিতা—কি আশ্চর্য।

অপূর্ব—আমারও একটু আশ্চর্য মনে হয়েছে। এই তিন মাসের মধ্যেও এদিকে একবারও এল না শান্তনু। অথচ সেখানেও···ঐ-যে

খেজুরগাছে ভরা পাহাড়টা দেখছো···সেখানে শান্তনুর একটা তাঁবু আছে; লোকজনও আছে। সেখানেও পাথর-তোলার কাজ চলছে। মাঝে মাঝে সেখানে আসে শান্তনু; কিন্তু আমাদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেতে পারে না।

—অথচ কত গল্পই না করলেন! তিতির শিকার করবেন: ঘুড়ি ওড়াবেন, আর···

—কিন্তু আমাদেরও একটা অন্যায় হয়েছে!

—কি অন্যায়?

—এতদিনের মধ্যে আমরাও তো ওকে একটা খবর পাঠাতে পারতাম। অন্তত একদিন এসে একটু খিচুড়ি খেয়ে যাবার জন্য একটা নেমন্তন্ন করা উচিত ছিল।

—করলেই পারতে। তোমার একটা জংলী গার্ডের হাতে একটা চিঠি দিয়ে শান্তনুবাবুর তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেই ভদ্রলোক নিশ্চয় আসতেন।

—আসতো বৈকি!

আর বেশিক্ষণ এখানে নয়! হরিণ-দেখা আনন্দ হয়তো নেকড়ে-দেখা আতঙ্কে মাটি হয়ে যেতে পারে, কারণ সন্ধ্যাটা ঘনিয়ে আসছে। মাঠের চোরকাঁটা মাড়িয়ে আবার সড়ক ধরবার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে অপূর্ব আর শমিতা।

শমিতা বলে—তবে এবার একদিন···

হেসে ফেলে অপূর্ব। —আর বলতে হবে না। শান্তনুকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি; যেন সময় করে একবার আসে।

—তবে মিছিমিছি এতগুলি বাজে-কথা বললে কেন?

—তোমার ইচ্ছাটাকে একটু বাজিয়ে দেখলাম।

—তার মানে?

—ভয় ছিল, তুমি বোধহয় একটু বিরক্তই হবে।

—কেন ?

—দেখলাম তো, তুমি কোন ঝঞ্ঝাট ভালবাস না।

—কিসের ঝঞ্ঝাট ?

—এই রান্না-রান্না ইত্যাদি। ডাল ভাত সেদ্ধ করতেই তুমি হিমসিম খাও।

—সে তো তোমারই ভুলের জন্য।

—আমার ভুল মানে ?

—তোমার কি কোন হুঁস আছে, মানুষের ঘরে কখন কি দরকার ? তোমাকে বার বার তিনবার মনে করিয়ে দিয়েছি, তবু তুমি মঙ্গলবারের হাট থেকে নুন আনিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছ ; মনে পড়ে তো ? সত্যি কিনা ?

—হ্যাঁ মনে পড়ে, খুব সত্যি কথা। কিন্তু চাকরটা একদিন আসেনি ব'লে যে তুমি আমাকে রাত দুটোর সময় ভাত খাওয়াবে, এটাও তো কাজের মানুষের পরিচয় নয় !

—কি করবো বল ? উনুন ধরাতে আমি পারিই না। তবু তো শেষ পর্যন্ত....

—হ্যাঁ, হাতে তিনটে ফোস্কা পড়িয়ে শেষপর্যন্ত উনুন ধরাতে পেরেছিলে।

—কিন্তু বিনা-নুনে রাঁধা খিচুড়ি যে খেতে হয়েছিল, সেটা কার ভুলের দোষ ?

—ও-ভুল আমার হবেই, শমিতা। আমি তেল-নুনের চর্চা কোনদিন করিনি।

সন্ধ্যার ছায়া একটু নিবিড় হয়েছে ; তবু দেখা যায় ; এই সড়কটা আরও কিছুদূর সোজা এগিয়ে যেয়ে ঠিক যেখানে বেঁকেছে, কতগুলি নিম নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে নতুন চুনকাম করা ফরেস্ট-অফিসের বাড়িটা ধবধব করছে। অফিস থেকে সামান্য

একটু দূরে যে আলোটা জ্বলছে, সেটা রেঞ্জার অপূর্বরই কোয়ার্টারের বাইরের ঘরের আলো।

সেটা অপূর্ব আর শমিতার এই তিন মাসের ঘরোয়া সংসারের আলো। পরিপাটি করে সাজানো তিনটে ঘর। রান্নাঘরটা কত পরিপাটি, যেন কোন আর্টিস্টের স্টুডিও। ঝকঝকে হাতা-খুন্তি আর বাসনগুলিকে শিল্পী-মানুষের কাজের সরঞ্জাম বলে মনে হয়।

মা যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনটি করে যেন আরও বড় আশার একটি গৃহস্থালির রূপ সাজিয়েছে শমিতা। বাপের আদরের হুকুমে যে শমিতাকে কোনদিন ঝাঁটা ধরতে হয়নি, সেই শমিতা যেন পৃথিবীর এই আরণ্য নিভৃতের মধ্যে প্রথম মানবীর মতো একটা প্রতিজ্ঞাময় দুঃসাহসের আনন্দে একটি ঘরোয়া সুখের জীবন গড়ে তোলবার জন্য দিনরাত খেটেছে; আজও খাটছে। ঝাঁটা হাতে নিয়ে বারান্দাটাকেই দিনে তিনবার পরিষ্কার করেছে।

হাঁপিয়ে উঠতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেজন্য কোন অভিযোগ করেনি শমিতা। অপূর্বকে শুধু এই অনুরোধটুকু করেছে: তুমি চেষ্টা করে একটু খোঁজ করে দেখ, গাঁ থেকে অন্তত একটা বুড়িকেও এনে দাও। বাসনগুলিকে একবার ছাই-মাজা ক'রে, আর ঘরের ভেতর-বার একটু ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে চলে যাবে। তাহলে আমার একটু সুবিধে হয়। অন্য পাঁচটা কাজ একটু মন দিয়ে করবার সময় তাহলে পাই।

অপূর্ব বলেছিল অবশ্য, চেষ্টা করে দেখবো, কিন্তু চেষ্টার কথাটা মনে করতেও বোধহয় ভুলে গিয়েছিল। তা না হলে এই তিনমাসের মধ্যে একটা বাসন-মাজা বুড়িকেও যোগাড় করে আনতে পারবে না কেন? শমিতা আবার মনে করিয়ে দেবার পর যেন একটু দুঃখিত হয়েই বলেছিল অপূর্ব,—আমার দ্বারা যে-কাজ সম্ভব নয় সে কাজ আমাকে করতে বললে আমাকে মিছিমিছি বিরক্ত করা হয়, শমিতা। তোমার

বাসন মাজবার জন্য কোথায় যে মানুষ পাওয়া যাবে, জানি না। তবে, পলে, এনে দেব ঠিকই।

চেষ্টা করতেই পারা যায় না, তাই চেষ্টা করে না; লোক পাওয়া গেল না বলেই লোক আনা গেল না; অপূর্বর প্রায় এই ধরণেরই একটা যুক্তিকে চুপ করে সহ্য করাই ভালো মনে করেছে শমিতা।

রাগও করেনি শমিতা; কারণ, নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছে, চাকরির কাজে অপূর্বকে কত ব্যস্ত থাকতে হয়। কোথায় বিশ মাইল দূরে জঙ্গলের কোন্ ক্যাম্প নিলাম হবে, সকালবেলা বের হয়ে, কাজ সেরে ফিরে আসতে রাত হয়ে যায়। শুধু চারখানা পরোটা আর দু'মুঠো আলুভাজা, রাত থাকতেই উঠে যা তৈরি করে দিতে পেরেছিল আর অপূর্বর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল শমিতা, শুধু তাই খেয়ে দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যা পার করে দিয়েছে অপূর্ব। এমন মানুষকে দিয়ে ঘরের দরকারের আর-পাঁচটা কাজে চেষ্টা করাতেও কুণ্ঠা হয়; এই তিনমাসের মধ্যে অপূর্বর এই অক্ষমতার উপরেও যেন শমিতার মনে একটা মায়া সত্য হয়ে উঠেছে। বেচারাকে বিব্রত করে লাভ নেই।

কাপড় কাচবার সোডা যেদিন ফুরিয়ে গেল সেদিন একবার মনে হয়েছিল শমিতার, অপূর্বকে যখন একবার খেলাড়ি ঘুরে আসতে হচ্ছেই, তখন বলে দিলে খেলাড়ি থেকে একসের সোডাও কি আনতে পারবে না অপূর্ব? বললে কি বিরক্ত হবে? 'সোডা চাই'— কথাটাকে কাগজে লিখে ফাইলের উপরে গুঁজে দিলেও কি দেখতে ভুলে যাবে?

থাক্‌গে, দরকার নেই। শমিতা নিজেই চাপরাসী সুখন-বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে আর একমাইল পথ হেঁটে স্টেশনে এসেছে, মাস্টারবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়ে সোডার দাম জমা দিয়েছে। আর মাস্টারবাবুর

স্ত্রী ট্রলি-ম্যান রামচরণকে বলে কোন্ এক স্টেশনের কাছের দোকান থেকে একসের সোডা আনিয়ে দিয়েছেন।

খুব ইচ্ছে হয়েছে, অপূর্বর জন্যে এখন থেকেই একটা সোয়েটার আরম্ভ ক'রে দিতে। কিন্তু সেজন্য এক পাউণ্ড খয়েরী রঙের উল পাওয়া চাই। কোথায় পাওয়া যাবে? কে আনিয়ে দেবে? ইচ্ছেটা মনের মধ্যেই চেপে দিয়েছে শমিতা। যাক্‌গে, এত তাড়াতাড়ি না করলেও চলবে। কলকাতা থেকে বড়দির ছেলে টুনু লিখেছে, পূজার ছুটিতে মহুয়ামিলানে বেড়াতে আসবে, সত্যিই টুনুটা যদি আসে, তবে টুনুকে লিখে দিলেই হবে, যেন একপাউণ্ড উল নিয়ে আসে।

একদিন পাক-প্রণালী বইটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুখ কালো করে আর আনমনার মতো গুম হয়ে বসেছিল শমিতা। ভাবতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আজ পর্যন্ত নতুন রকমের কোন খাবার দূরে থাকুক, কিসমিসের পায়েসের মতো একটা সাধারণ ভালো খাবারও অপূর্বকে খাওয়াতে পারেনি শমিতা। কিন্তু শমিতাই জানে, নতুন জামাই হয়েও এই মানুষটাই রামগড়ের বাড়িতে ছোট পিসীমার কাছ থেকে তিনবার কিসমিসের পায়েস চেয়ে খেয়েছিল। কিন্তু এই সেদিন কিসমিসের কথা তুলতেই অপূর্ব বলে দিল—ওরে বাবা, কিসমিস পেতে হলে আফগানিস্তানে যেতে হবে।

শমিতা অবশ্য জানে যে, মোটেই আফগানিস্তানে যাবার দরকার হয় না। স্টেশনে গিয়ে টোরি পাইলটের চিন্তামণিবাবুকে একটু অনুরোধ করলে আর দামটা দিয়ে দিলেই হয়; তাহলেই চিন্তামণিবাবু অনায়াসেই ইঞ্জিনের খালাসীকে দিয়ে চান্দোয়া থেকে একপোয়া কিসমিস কিনিয়ে পরের দিনই মহুয়ামিলানে পৌঁছে দিতে পারেন! কিন্তু এই সামান্য চেষ্টা করবার মতো সামান্য ইচ্ছাটাও যেন অপূর্বর

জীবনের একটা ভয়। এরকম একটা সামান্য ঘরোয়া দাবির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেই জানে না, পারেও না অপূর্ব।

কিন্তু ব্যস্ত হয়ে সেইসব আশার গল্প বলতে উৎসাহের একটুও অভাব নেই অপূর্বর। এই তিনমাসের মধ্যে সে-সব আশার গল্পের সঙ্গে আরও অনেক কল্পনার গল্পও ভিড় করেছে।—আকাশটা একটু পরিষ্কার হোক আর পূর্ণিমাটা এসে পড়ুক, সন্ধ্যা হতেই বেরিয়ে পড়তে হবে শমিতা। বেশি দূর নয়; মাত্র আধ মাইল হবে, দেবদারুর ছোট্ট একটা জঙ্গল আছে, ঠিক কুঞ্জের মতো দেখতে। একটা প্রকাণ্ড কালো পাথরও পড়ে আছে সেখানে। কোন্ এক শৌখিন সাহেব নাকি অনেকদিন আগে সেখানে শিকার করতে এসে জ্যোৎস্না ছড়ানো দেবদারুকুঞ্জের মায়ায় উতলা হয়ে যেত। বন্দুক রেখে দিয়ে একটা গীটার নিয়ে সেই কালোপাথরের উপর বসতো সেই শৌখিন সাহেব। পাথরের মাথার উপর ওঠবার সুবিধার জন্য সাহেব নিজেই পয়সা খরচ করে পাথরটার গায়ে খাঁজ কেটে কেটে সিঁড়ির ধাপের মতো কতকগুলি ধাপ তৈরি করে নিয়েছিল। তোমার কোন অসুবিধা হবে না, শমিতা! তুমিও অনায়াসে পাথরের গায়ে খাঁজকাটা সেই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে পারবে।

হ্যাঁ, আরও একটা জায়গা আছে, কিন্তু ঘোর বর্ষার সময় সুবিধে হবে না, শমিতা; অন্তত ভাদ্রটা শেষ হলে তবেই সে-জায়গায় যাওয়া উচিত। খুব জোলো দিন আর খুব শুকনো দিনও নয়; এইরকম একটি দিনে কান্তি-নির্ঝর দেখে আসতে হবে। সেদিনটা হাতে আর কোন কাজ রাখবো না। শুধু বিনা-কাজের আনন্দে তুমি আর আমি সারাটা দুপুর আর বিকেল কান্তি-নির্ঝরের পাশে বসে থাকবো। কালো সাদা আর নানা রঙে রঙীন পাথরের উপর দিয়ে জলের ধারা নেচে নেচে ফোয়ারা ছুটিয়ে

আর অদ্ভুত শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ; শালবনের বাতাসও সেখানে ছটফট করে না। পাখির ডাকও খুব কম শোনা যায়। তাও শুধু ঘুঘুর ডাক। মনে হবে, জঙ্গলের ভিতরে লুকানো একটা জাদুর রাজ্যে আমরা বসে আছি।

দুটো দিন হাতে পেলে আরও দূরে যেতে পারা যাবে। চলে যাব সোজা লাতেহার। শহর হিসাবে লাতেহার কিছুই নয়। কিন্তু ফরেস্ট-বাংলোটা চমৎকার। একটা দিন বাংলোতে কাটিয়ে দিতে তোমার কোনই অসুবিধা হবে না। বিকেলের রোদ একটু নেমে যেতেই দুজনে বের হয়ে যাব। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে, শমিতা; লাতেহারের সেই পাহাড়; সঞ্জীববাবুর পালামৌ-জীবনের প্রিয় সেই একশিলা-পাহাড়।

যদি ভয় না পাও তবে আর-একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। সেজন্যেও কম ক'রে দুটো দিন হাতে চাই। যাই হোক, সে-ব্যবস্থা করে নিতে পারবো। সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে যাব। কিংবা চাতরা যাবার বাস ধরলেও চলবে। নগরবস্তি নামে একটা গাঁয়ের কাছে জঙ্গলের মধ্যে খুব পুরনো কালের একটি কালীমন্দির আছে। সন্ধ্যাবেলা মন্দিরের আরতি দেখবার সাহস যদি থাকে...

শমিতা আনমনার মতো অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেও প্রশ্ন করেছিল,—আরতি দেখতে সাহস হবে না কেন?

—আরতির ঘণ্টার শব্দ বেজে ওঠবার একটু পরেই দেখতে পাবে, মন্দিরের আঙিনা থেকে কিছুদূরে পাকুড়গাছের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভক্ত। প্রকাণ্ড মুখ, বড় বড় থাবা আর ডোরাকাটা এক ভক্ত।

—তার মানে?

—একটি রয়্যাল-বেঙ্গল। ওর নাম ভক্তবাবা, কেউ বা বলে মায়াবাঘ। কিন্তু মানুষের ওপর কোন উপদ্রব করে না; বিশেষ

ক'রে কালীমন্দিরের প্রসাদী মিছরি যদি সঙ্গে থাকে, তবে তো কথাই নেই। ভক্তবাবা নিজেই আগে আগে হেঁটে সড়কের মানুষকে জঙ্গলের পথ পার করে দেয়। বাঘটা রোজই রাত্রিতে নগরবস্তি থেকে মহুয়ামিলান পর্যন্ত এসে আবার ফিরে যায়। মহুয়ামিলানের জঙ্গলে নাকি ওর কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে।...যাই হোক, রাজী আছ কিনা বল।

শমিতা হাসে—রাজী আছি বৈকি।

অপূর্ব—ভয় করবে না?

শমিতা—তুমি পাশে থাকলে ভয় করবে কেন?

এই তিনমাসের মধ্যে এতগুলি গল্পের কল্পনার মধ্যে সত্য হতে পেরেছে শুধু একটি কল্পনা; হরিণ দেখবার জন্য আমলকীর জঙ্গলের কাছে বেড়াতে যাওয়া। আর এতগুলি গল্পের আশার মধ্যে সত্য হতে পেরেছে, শুধু একটি আশা; হরিণ দেখতে পেয়েছে শমিতা। এই প্রথম, তিনমাসের মধ্যে এই আজ; একটি বেলার মতো সব কাজের দায় দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে অপূর্ব; আর শমিতাকে সঙ্গে নিয়ে মহুয়ামিলানের আরণ্য নিভৃতের সেই কুহকের কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছে, সেখানে এসে দাঁড়ালে সরকারী কোয়ার্টারের স্বামী-স্ত্রীও রূপকথার মানব-মানবীর মতো অপার্থিব হয়ে যায়।

অপূর্বর হাত ধরে আর পথ হেঁটে এগিয়ে যেতে যেতে এই সন্ধ্যার বাতাসটাকে সত্যিই যে একটু অপার্থিব মনে হয় শমিতার; সেইসঙ্গে প্রাণটাকেও। অনেক দূর থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। এরই মধ্যে পূবদিকে তিন-চারটে তারা ঝিকমিক করতে শুরু করেছে। অপূর্বর নিশ্বাসের শব্দগুলিকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে শমিতা।

মনে হয়, অপূর্বর বুকের ভিতরে একটা উৎসব জেগেছে। এই তিনমাসের মধ্যে কোনদিন এভাবে এত নিবিড় আগ্রহে শমিতার হাত চেপে ধরেনি অপূর্ব। কোয়ার্টারের ভিতরে সকাল-সন্ধ্যার কাজের

দাবিগুলি শমিতাকে যেন লুফে নিয়ে সারাক্ষণ এদিকে আর ওদিকে ছুটিয়ে-খাটিয়ে একেবারে ছন্নছাড়া করে দেয়। রান্নাঘরের ধোঁয়া, কুয়োতলার জলের বালতি, বারান্দার ঝাঁটা ; হাঁড়ি আর হাতা-খুন্তি, বঁটি আর শিল-নোড়া—সব মিলে যেন শমিতাকে টানাটানি আর ছেঁড়াছিড়ি করতে থাকে। অনেকে সময় ডাক দিয়েও শমিতাকে কাছে পায় না অপূর্ব।

—আঃ, দিনটা আজ বেশ কাটলো।—কথা বলতে গিয়ে অপূর্বর গলার স্বর যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তির সুখে নিবিড় হয়ে ওঠে।

শমিতা বলে—একটু দেরি হয়ে গেল।

—কিসের দেরি ?

—আর একটু আগে ঘরে ফিরতে পারলে ভালো হতো।

—কেন ?

—তোমার বালিশটা বড্ড নেতিয়ে গিয়েছে ; তূলো কম থাকলে এ-দশাই হয়।

—কিছুই বুঝলাম না। সেজন্যে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবে কেন ?

—এক সের শিমুল তূলো আসবার কথা আছে। সন্ধ্যা হবার আগেই নিয়ে আসবে বলেছিল।

—কে বলেছিল ?

—স্টেশনের মাস্টারমশাই-এর মেয়ে টুনি।

—টুনি কোত্থেকে শিমুল-তূলো আনবে ?

—ওদেরই বাড়িতে আছে। গতবছর তিনটে শিমুলের তূলো ভেঙেছিলেন মাস্টারমশাই। তার প্রায় সবই জমা আছে।

—তুমি এসব খবর পেলে কেমন করে ?

—টুনি এসেছিল। টুনিকেই বলেছিলাম জিজ্ঞেস করে দেখতে, ওর গার্ড-মামা ডালটনগঞ্জ থেকে একসের শিমুল-তূলো এনে দিতে

পারেন কিনা। কিন্তু টুনি বললে, অনেক তূলো ওদের বাড়িতেই আছে।

—সুতরাং, সোজা চেয়ে বসলে ?

শমিতা হাসে।—একটা দরকারের জিনিস চাইতে···

—দরকারের জিনিস বলেই কি তুমি যার-তার কাছে একেবারে ভিক্ষে-সিক্ষে শুরু করে দেবে ?

—তুমিই তো···

—কি ?

—রোজই বলছো যে, বালিশটারই জন্যে তোমার ভালো ঘুম হচ্ছে না। তাই মনে হলো, অন্তত আধসের-খানেক তূলো ঠেসে দিলে বালিশটা একটু টান হবে, তোমারও ঘুমোতে আর কোন অস্বস্তি হবে না।

—থাক্ ওসব কথা।

—বেশ তো, তোমার যদি এখন আর বেড়াবার ইচ্ছে থাকে তো চল, এখনই ঘরে ফেরবার দরকার নেই।

—হ্যাঁ···কিন্তু···একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো শমিতা, মনে হচ্ছে, বাইরের ঘরের আলোটা বারান্দার উপর জ্বলছে।

অপূর্বর কোয়ার্টার একেবারে কাছেই এসে পড়েছে। এখন সড়ক থেকে নেমে ফরেস্ট-অফিসের সামনের ছোট মাঠটা শুধু পার হলেই হয়। শমিতাও দেখে আশ্চর্য হয়, যে-আলোটাকে নিভু-নিভু করে ঘরের ভিতরে জানালার কাছে রেখে এসেছিল শমিতা, সেই আলোটাই বারান্দার উপর জ্বলজ্বল করছে।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে অপূর্ব, আর সেই ব্যস্ততার ঝোঁকে শমিতার হাতটাকে যেন একটা হেঁচকা টান দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—শান্তনু এসেছে।

শমিতা—কে বললে ?

অপূর্ব—আমি বলছি। আমিই ওকে আসবার জন্যে চিঠি দিয়েছিলাম।

শমিতা—কিন্তু আমাকে তো আগে এ-কথা বলোনি যে আজই আসবেন শান্তনুবাবু?

অপূর্ব—বলবার দরকার মনে করিনি।

—কেন?

—চিঠি পেয়েও আসবে কি না-আসবে, তার তো কোন ঠিক ছিল না। শান্তনুকে আমি চিনি। যতক্ষণ চোখের সামনে ততক্ষণ খুব ভালো; কিন্তু একটু দূরে গেলেই সব ভুলে যায়। বন্ধুত্ব বল আর ভদ্রতাই বল, দূরে চলে গেলে শান্তনু সবই ভুলে যেতে পারে। তা না হলে বিশবছরের মধ্যে আমাকে একটা চিঠিও দিতে পারেনি কেন শান্তনু?

—কিন্তু…

—কি?

—তুমি কি এরকম একটা অসময়ে আসবার জন্যে শান্তনুবাবুকে চিঠি দিয়েছিলে।

—অসময়ে মানে? শান্তনুকে আজ রাত্রিরে আমাদের এখানেই খেয়ে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছি।

—খেয়ে যাবার জন্য? নেমন্তন্ন? প্রশ্ন করতে গিয়ে আতঙ্কিতের মতো চম্‌কে ওঠে শমিতা।

অপূর্ব যেন খুশিতে বিহ্বল হয়ে বলে—হ্যাঁ। ভাত, ডাল, মাছের ঝোল আর পটল-ভাজা, আর সামান্য একটু চিঁড়ের পায়েস।

শমিতা—কি বললে?

অপূর্ব—শান্তনু যেন নেমন্তন্নর কথা শুনে একটা বড়রকমের ভোজের ব্যাপার, পোলাও আর মাংস-টাংস না আশা ক'রে বসে, সেইজন্যে চিঠিতে স্পষ্ট করে একেবারে লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে…

শমিতা—কিন্তু মাছ কোথায় ?

অপূর্ব—কি বললে ?

শমিতা—পটল-ই বা কোথায় ? চিঁড়ের পায়েস-ই বা হবে কি দিয়ে ? তোমার জংলী গার্ড-বুড়ো যে এক-আধ পো দুধ দিয়ে যেত, সেটুকুও আজ দেয়নি। ওর গরুকে নাকি বাঘে খেয়েছে।

অপূর্ব—কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়।

শমিতা ভ্রূকুটি করে।—ছিঃ, কী বিপদেই না ফেললে! রাত্রি হয়ে এসেছে, এখন কোন ব্যবস্থা করবারও যে উপায় নেই।

অপূর্ব—তাহলে আর বৃথা চিন্তা করবার দরকার কি ? যা আছে তাই খুশি হয়ে খাবে শান্তনু।

শমিতা—শান্তনুবাবু না-হয় খুশি হয়ে খেলেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে না কি ?

না, আর কোন কথা বলে আলোচনা করবারও সুযোগ নেই। কোয়ার্টারের বারান্দার সিঁড়িটারই কাছে এসে পড়েছে অপূর্ব আর শমিতা। এখন কথা বললে, সে-কথার শব্দ বারান্দার জ্বলজ্বলে বাতিটার কাছে পৌঁছে যাবে, যে বাতিটার কাছেই রেলিং-এর উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষের আলোছায়াময় চেহারা। হ্যাঁ, সত্যিই শান্তনু।

শান্তনু চেঁচিয়ে হাসতে থাকে।—পেটুক মানুষকে নেমন্তন্ন করেছেন, এবার বুঝুন ঠেলা।

শমিতার-ই মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে আর কথা বলছে শান্তনু। কিন্তু শমিতা আশ্চর্য হয়ে, অন্যদিকে, বারান্দার মেজেরই একপাশে জড়ো করা কতকগুলি ঘরোয়া সম্ভারের দিকে তাকিয়ে থাকে। টিনের ছোট ছোট দুটি ড্রাম, একটা চটের থলি—যার ঠাসা পেটটা ফুলে রয়েছে ; অ্যালুমিনিয়মের একটি ক্যান, চিমড়ে কাগজে

জড়ানো ছোট ছোট পোঁটলা, আর পদ্মপাতায় জড়ানো কি-যেন একটা বস্তু।

শান্তনু বলে—অনেক চেষ্টা করলাম, নানা জায়গায় খোঁজও নিলাম, কিন্তু সোনা-মুগ পেলাম না, অগত্যা ভালো পাটনাই ছোলার ডাল নিয়ে এলাম। আর···

অপূর্ব—অ্যালুমিনিয়ামের ক্যানের ভিতরে কী জিনিস?

শান্তনু—দুধ। পোঁটলার একটাতে চিঁড়ে আর আর-একটাতে চিনি।

অপূর্ব—ড্রাম-দুটোর ভেতরে?

শান্তনু—এটাতে সরু চাল; আর ওটাতে পটল, পাঁচরকমের ফোড়ন আর মশলা, আর একশিশি গাওয়া-ঘি।

অপূর্ব—আর পদ্মপাতায় জড়ানো ওটা···

শান্তনু—আড়মাছের পেটি। একটা কুলীকে পাঠিয়ে দামোদরের দহ থেকে মাছটাকে লাঠিপেটা করে মেরে···অনেক ঝঞ্ঝাট স্বীকার করে যোগাড় করতে হয়েছে হে।

শমিতা অপ্রসন্নভাবে বলে—আপনি এ কিরকমের কাণ্ড করলেন!

অপূর্ব—এর মধ্যে আবার কাণ্ড-টাণ্ড কি দেখলেন? কতগুলো নিতান্ত দরকারের জিনিস নিয়ে এসেছি। জানি তো, এখানে এসব সামান্য দরকারের জিনিসও হঠাৎ চেষ্টা করলে পাওয়া যায় না।

শমিতা—কিন্তু, ব্যাপারটা যে উল্টে গেল।

শান্তনু—তার মানে?

শমিতা—নেমন্তন্নটা তাহলে আপনিই করলেন। আপনি খাওয়াচ্ছেন, আমরা খাচ্ছি।

শান্তনু—একেবারে বাজে কথা, খুব ভুল-কথা বললেন।

শমিতা—কেন?

শান্তনু—আপনাদের খাওয়াতে হলে, ছোলার ডাল আর পটল-ভাজা খাওয়াবো কেন?

অপূর্ব বাধা দেয়।—তুমি চুপ কর, শমিতা; শান্তনুকে তুমি চেন না, ওকে আর উস্‌কে দিয়ো না। হয়তো এখনি নিজের হাতে পাঁটা কেটে আমাদের খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

শান্তনু বলে—হ্যাঁ, এখন আর কথা-টথা নয়; এখন কাজ।... উনোনটা কি ধরানো আছে?

শমিতা হাসে। —না; এখনি ধরিয়ে ফেলবো।

শান্তনু—কাঠ না কয়লা, কিসের আগুনে রান্না করেন আপনি?

শমিতা—যখন যেটা সুবিধে হয়।

অপূর্ব বলে—চল শান্তনু, আমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে বসি। শমিতাকে ছেড়ে দাও।

শান্তনু তবু শমিতারই দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে। —জল তোলা আছে তো?

শমিতা আবার হাসে। —আছে বৈকি!

শান্তনু—সত্যি করে বলুন; দরকার থাকে তো এখনই কুয়ো থেকে দু'চার বালতি জল তুলে দিতে পারি!

শমিতা—কি-যে বলেন! আপনি এখন বন্ধুর সঙ্গে গল্প-টল্প করুন। আপনাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না।

কিন্তু আবার ব্যস্ত হয় শান্তনু। বারান্দায় একপাশে জড়ো করা সামগ্রীগুলিকে দু'হাতে জড়িয়ে, বুকের সঙ্গে প্রায় চেপে ধ'রে আবার শমিতার মুখের দিকে তাকায়।—কোথায় আপনার রান্নাঘর, একবারটি দেখিয়ে দিন।

শমিতা চেঁচিয়ে ওঠে।—ছিঃ, কি করছেন শান্তনুবাবু! আপনি এসব এখানেই রেখে দিন, আমিই নিয়ে যেতে পারবো।

শান্তনু—আমি নিয়ে গেলে কি আপনার হেঁসেল অশুদ্ধ হবে?

—হবে।—এবার বেশ একটু শক্ত করেই কথাটা উচ্চারণ করে শমিতা।

কিন্তু অপূর্ব হেসে ফেলে ।—এই যে, এই ঘরের ভিতর দিয়ে সোজা চলে যাও, শান্তনু ; তারপর উঠোনটা পার হয়ে পশ্চিম দিকের ছোট ঘরটা , ওটাই হলো রান্নাঘর।

আর একমুহূর্তও দাঁড়িয়ে না থেকে, ঘর আর উঠোন পার হয়ে' আর রান্নাঘরের দরজার কাছে জিনিসগুলি রেখে দিয়ে ফিরে আসে শান্তনু ! শমিতা কিন্তু বেশ গম্ভীর হয়ে চলে যায়।

অপূর্ব—বাস্, আর তুমি ব্যস্ত হতে পারবে না, শান্তনু। এস, ঘরের ভেতরে বসি।

ঘরের ভিতরে বসে দুই বন্ধুতে মিলে আবার গল্প করে, কুষ্টিয়াতে মামার বাড়ির কলাবাগানে সজারু শিকার করবার গল্প। কি-ভয়ানক চালাক কুষ্টিয়ার সজারু! গর্তের ভিতরে ধোঁয়া ঢুকিয়ে দিতে গেলেই ঝুম-ঝুম করে ছটফটিয়ে এক-একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে যেত।

শান্তনু—মনে পড়ে তো, অমন বাঘা কুকুরটাকেও কি-ভাবে ঘিরে ধরে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল পাঁচটা বাচ্চা সজারু। কাঁটার ঝালর নাচিয়ে সে কী অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ ; পিটপিট করে জ্বলছে রাগন্ত চোখগুলো।

অপূর্ব—এঃ, ঘরের ভিতরে এত ধোঁয়া আসছে কোত্থেকে ?

শান্তনু উঠে দাঁড়ায় ; উঠোনের দিকে উঁকি দিয়ে বলে—উনোনটা বোধহয় ঠিক ধরছে না।

অপূর্ব—তুমি বোসো। উনোন ঠিক ধরে যাবে। শমিতা এখন উনোন ধরাতে ওস্তাদ হয়ে গিয়েছে।

শান্তনু বসে। চুপ করে সিগারেট ধরায়। তারপরেই গল্প শুরু

করে।—শুনলে আশ্চর্য হবে অপূর্ব, এখানে··· তার মানে এখান থেকে মাত্র তিনমাইল দূরে, হিন্দেগীর স্টেশনের কাছাকাছি একটা জায়গায় সেদিন দেখলাম, ছোট্ট একটা জলভরা ধানক্ষেতের মধ্যে চমৎকার মৌরলার ঝাঁক ছুটোছুটি করছে; দেখতে ঠিক কুষ্টিয়ার নন্দীদের পুকুরের মৌরলার মতো। কিন্তু হাতের কাছে তখন একটা গামছাও ছিল না; থাকলে, অন্তত পোয়াটেক মৌরলা তুলতে···

শান্তনু হঠাৎ গল্প থামিয়ে যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

অপূর্ব—কি হলো?

শান্তনু— রাত করে আবার শিল-নোড়া ঘাঁটাঘাঁটি করা কেন? গৃহিণীকে বলে দাও অপূর্ব, মশলা বাটবার দরকার নেই।

অপূর্ব—কেন?

শান্তনু—আমি যে গুঁড়ো-মশলা নিয়ে এসেছি। জানি তো, রাত করে মশলা-বাটা কত ঝঞ্ঝাটের কাজ।

অপূর্ব— যেতে দাও, ছেড়ে দাও। বেচারা নিজের খুশিমতো কাজ করছে, করতে দাও!

শান্তনু তবু উঠে দাঁড়ায়; ঘর পার হয়ে বারান্দায় গিয়ে আর গলার স্বর প্রায় পঞ্চমে তুলে ডাক দেয়—শুনছেন?

শমিতা—কি?

শান্তনু—আপনি ভুল করছেন। মিছে মশলা বাটবার হাঙ্গামা করবেন না। ড্রামের ভেতরে মোড়ক-করা সবরকমের গুঁড়ো-মশলা আছে। তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে নিন।

শিল-নোড়া নিয়ে ব্যস্ত শমিতার হাত-দুটো যেন হঠাৎ বিস্ময়ে অলস হয়ে যায়। শমিতার চোখ-দুটোও হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। মাথার উপর কাপড়টা টেনে দিতেও ভুলে গিয়েছে শমিতা।

বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে শান্তনু, তাই শান্তনুর মুখটাকে স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না। বোধহয় সেইজন্যেই

মনে হয়, যেন একটা অশরীরী স্নেহের উদ্বেগ কথা বলেছে। রাত করে ঠাণ্ডা জল ঘেঁটে আর শক্ত শিল-নোড়া বাজিয়ে শমিতার হাতদুটো যেন মিছিমিছি একটা মেহনতের কষ্ট সহ্য না করে।

কোনে উত্তর দেয়না শমিতা। কিন্তু শিল-নোড়ার শব্দ থামিয়ে দিয়ে আর হাত ধুয়ে উঠে যায়। ড্রামের ভিতর থেকে গুঁড়ো-মশলার মোড়ক বের করে। আর, কোন দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে, শান্তবাবুও আর কোন চেঁচামেচি না ক'রে, যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ঘরের ভিতরে চলে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন।

রাত খুব বেশি হয়নি। রান্না সারতে তিন ঘন্টার বেশি সময় লাগেনি। দুই বন্ধুর খাওয়া শেষ হতে আরও একঘন্টা লাগে। দুই বন্ধুব আলাপ মাঝে মাঝে খুশির হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও, শমিতা শুধু কাছে দাঁড়িয়ে আর নীরব হয়ে শোনে। বেশ গম্ভীরও হয়ে গিয়েছে শমিতা। মাছের ঝোলটা দু'বার চেয়ে খেয়েছে শান্তনু; কিন্তু অপূর্ব বলেছে, ঝাল বেশি হয়েছে। তবু শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি শমিতা: আপনি যে কিছু বলছেন না? সত্যি, ঝালের কষ্ট চুপ করে সহ্য করলেন, না, সত্যিই বেশি ঝাল খেতে ভালবাসেন?

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শান্তনু বলে,—পৌনে দশটা।

অপূর্ব চেঁচিয়ে ওঠে। —এত রাত! তাহলে তোমাকে আজ এখানেই থাকতে হয়, শান্তনু।

শান্তনু—মোটেই না।

অপূর্ব—কেন?

শান্তনু—ঘরের ভেতর আমার ঘুমই হবে না।

অপূর্ব—তুমি যে দেখছি, সত্যিই যাযাবর হয়ে গিয়েছ।

শান্তনু—তা জানি না; কিন্তু তাঁবুর ভিতরে খাটিয়ার উপর

একটি সতরঞ্চি আর গায়ের উপর একটি ভুটিয়া-কম্বল না থাকলে আমার চোখে ঘুমই আসে না।

অপূর্ব বলে--কিন্তু এত রাত্রে তুমি তাঁবুতে যাবে কি করে? রাস্তা কি নিরাপদ?

শান্তনু—একটুও নিরাপদ নয়! গত চারদিনের মধ্যে ভালুকের উৎপাতের চারটে ঘটনা থানাতে রিপোর্ট হয়েছে।

অপূর্ব · তবে?

শান্তনু --আমি একা নই। আমার দুটো কুলীকে ষ্টেশনে বসিয়ে রেখে এসেছি। বন্দুক আর লণ্ঠনও আছে।

-- এস তবে।—অপূর্ব তবু যেন আপত্তির সুরে বিড়বিড় করে।

কিন্তু চলে যাবার জন্য একটুও ব্যস্ত না হয়ে শমিতার মুখের দিকে তাকায় শান্তনু। —আপনি খেয়ে নিন।

শমিতা—খাব তো নিশ্চয়ই; কিন্তু আপনি কি···

শান্তনু—আমি ততক্ষণ আছি।

চমকে ওঠে শমিতা।—আপনাকে ততক্ষণ থাকতে বলছি না। কথা হলো, সত্যিই এত রাত্রে তাঁবুতে ফিরে না গেলে কি চলতো না?

শান্তনু আবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—আপনার উদ্বেগ দেখে সত্যিই না হেসে থাকতে পারছি না। আপনি কি জানেন যে, আমাকে প্রায় রোজই রাত্রিতে জঙ্গলের পথে হাঁটতে হয়?

শমিতা—কেন?

শান্তনু—কোয়ারি থেকে কাজ দেখে ফিরতে একটু দেরিই হয়ে যায়। তা ছাড়া, বাঘ-ভালুকের ভয়ের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে মন্দও লাগে না।

অপূর্ব—আমি যে বলেছি, শান্তনুর শুধু স্বভাবটা নয়, প্রাণটাই যাযাবর। ঘরের শান্তি পছন্দই করে না শান্তনু; ওর ভালো লাগে ঘরছাড়া জীবনের যত অশান্তি। সেইজন্যই বোকাটার কপালে

আজও ঘর জুটলো না। জুটবেই বা কেন? এ রকম মানুষকে বিয়ে করতে চাইবে কোন্ মেয়ে?

শান্তনু—তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

—আসুন তবে।—শমিতা যেন এই রাত্রিটারই একটা বিশ্রী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে; গলার স্বরের বিরক্তভরা রুক্ষতার আওয়াজটাও তাই প্রমাণ করে।

—কিন্তু···শান্তনু আবার কথা বলবার চেষ্টা করতেই শমিতা বাধা দেয়—কিন্তু আবার কি? আমার খাওয়া পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করবার কোন মানে হয় না।

রওনা হয় শান্তনু। কিন্তু শান্তনুর চোখ-মুখের প্রসন্নতার মধ্যে কোন বিকার নেই। সিগারেট ধরিয়ে আর হেসে হেসে তবু বলতে থাকে,—মাছ-টাছ কিছু রেখেছেন তো? না, সবই আমরা সাবাড় করে দিলাম?

শমিতা—কিছুই সাবাড় করেননি আপনারা। সবই আছে।

শান্তনু—পায়েসটা?

শমিতা—আছে। কিন্তু আমি পায়েস খাই না।

শান্তনু—খেলে পারতেন। আমি নিজে এক ক্রোশ পথ হেঁটে জয়গড়ের কুমারসাহেবের বাড়িতে গিয়ে দুধ যোগাড় করেছি। মণ্টগোমারি গরু, কুমারসাহেবের কত আদরের গরু; আর কী চমৎকার তার দুধ!

চলে যায় শান্তনু।

॥ তিন ॥

মহুয়ামিলানের ফরেস্ট-রেঞ্জারের কোয়ার্টারে শমিতা আর অপূর্বর ঘরোয়া সংসারের ছবিটা আর সেই সংসারের রীতিনীতিটা তিনমাসের মধ্যে এমন কিছু বদলে যায়নি, যে-জন্যে বাইরের কোন মানুষের চোখে কোন বিস্ময় কিংবা কোন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে! কিন্তু তিনটি বছর পার হবার পর?

প্রায় তিনটি বছর পার হয়েছে, আর, সত্যিই কারও কারও চোখে ভয়ানক একটা সন্দেহ-কঠিন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তা না হলে ষ্টেশনের মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী হঠাৎ চিন্তামণিবাবুর স্ত্রীর কাছে বলে ফেলবেন কেন—কে যে বাড়ির কর্তা, আর কে যে বন্ধু, কিছুই বোঝা যায় না।

চিন্তামণিবাবুর স্ত্রী বলেন—আমি যে সত্যিই পাথরবাবুকে জঙ্গলবাবু মনে করে ফেলেছিলাম। না মনে করে পারবোই বা কেন? সেদিন গিয়ে দেখি, ভিতরের ঘরে এক ভদ্রলোক স্টোভ ধরিয়ে জল গরম করছেন বাচ্চাটার ফুড করবার জন্য। আর, এক ভদ্রলোক বাইরের ঘরে তক্তপোশের উপর শুয়ে বই পড়ছেন। হা ভগবান, শমিতারই কথা থেকে পরে বুঝলাম যে, বাইরের ঘরের ভদ্রলোকই হলেন অপূর্ববাবু; আর ভেতরের ঘরের ভদ্রলোকটি অপূর্ববাবুর বন্ধু শান্তনুবাবু।

—বাচ্চাটি কিন্তু বড় সুন্দর হয়েছে। একেবারে বাপের মুখটি বসানো। বাপও তো বেশ সুন্দর!

—অ্যাঁ, বাপ মানে…

—ছিঃ, আপনি অতটা সন্দেহ করবেন না। আমি অপূর্ববাবুর কথাই বলছি।

—না না, সন্দেহ করছি না। আমি বলছিলাম, পাথরবাবু মানুষটিও তো দেখতে ভালো।

—তা, ভালো বৈকি!

—কিন্তু বিয়ে করলেন না কেন?

—তা জানি না। উনি বলেন, বিয়ে করবার জন্য ভদ্রলোকের কোন গরজ-বালাই নেই। ঘরের চেয়ে তাঁবু বেশি ভালবাসেন।

—কিন্তু আমি তো দেখলুম, তাঁবু ছেড়ে দিয়ে একজনের ঘরের ভিতরে এসে বাচ্চা ছেলের জন্য ফুডের জল করতে বেশ ভালবাসেন। এরকম পুরুষকে তো বাউণ্ডুলে বলে মনে করতে পারছি না।

—মনের ভিতরে হয়তো ঘর পাওয়ার সাধ আছে। ঘর হয় না বলেই বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

—তা হবে। কিন্তু শমিতার তো একটু লজ্জা থাকা উচিত।

—খুব ঠিক কথা বলেছেন। হলেনই বা স্বামীর ছেলেবেলার বন্ধু, তাই বলে ঘরের সব কাজের দরকারে শুধু পাথরবাবুকেই ডাকাডাকি করা; এটা কিন্তু একটুও ভালো লক্ষণ নয়।

—স্বামী ভদ্রলোকই বা এরকম উদাস কেন? ঘরের দায় বন্ধুর হাতে ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বই পড়ছেন!

—এটাও ভালো লক্ষণ নয়।

—কিন্তু যখন বদলি হয়ে অন্য রেঞ্জে চলে যাবেন অপূর্ববাবু, তখন শমিতার কি উপায় হবে? স্বামীর বন্ধুকে চাকরের মতো খাটাবার সুযোগ আর হবে কি?

—কোন বিশ্বাস নেই। পাথরবাবুও বোধহয় তাঁবু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই রেঞ্জের জঙ্গলের মধ্যে ডেরা পাতবেন।

—তাহলে আর তাঁবুর বালাই রাখিস কেন রে মিন্‌সে। ঘরের ভিতরে এসেই ঠাঁই নে-না কেন? তোরও ছুটোছুটির হয়রানি একটু কমুক।

—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শেষে তাই দাঁড়াবে বলে ভয় হয়।

—আমারও সেই ভয়।

স্টেশনের মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী আর চিন্তামণিবাবুর স্ত্রীর ভাবনা এরই মধ্যে যে ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছে, সে ভয়ের কোন চিহ্ন কিন্তু ঘরের মানুষগুলির ভাবনায় ফুটে উঠতে দেখা যায় না। অপূর্বর প্রসন্ন মনের শান্তি একটুও বিচলিত হয়নি; বরং যেন হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হবার একটা সৌভাগ্যে খুশি হয়ে উঠেছে অপূর্ব। ঘরের দাবির জন্য খাটবার আর ছুটোছুটি করবার, এমনকি একটু উদ্বিগ্ন হবারও আর দরকার হয় না। শান্তনু আছে। রোজই আসে শান্তনু; শমিতার সংসার-বাসনার সব তাগিদ সহ্য করবার ভার নিয়েছে শান্তনু। এই সেদিনও, বিছানার ছেঁড়া চাদর শেলাই করতে বসেছিল শমিতা; শান্তনু আপত্তি করেছিল—নতুন চাদর কিনলেই তো হয়।

শমিতা—আমারও ইচ্ছে, কোন নতুন ডিজাইনের একটা চাদর কিনি।

শান্তনু—আটটি টাকা দিন, ডালটনগঞ্জের 'তাঁত কো-অপারেটিভ'-এর চাদর আনিয়ে দিচ্ছি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

টাকা দিয়েছে শমিতা; আর; তিনদিনের মধ্যেই ডালটনগঞ্জ থেকে নতুন চাদর আনিয়ে দিয়েছে শান্তনু। আঃ, চাদরের ডিজাইন দেখে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে গিয়েছে শমিতার।

শমিতার ঘরোয়া সুখের সব সাধ-ও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে; তাই সারাক্ষণ শমিতার মুখে হাসি লেগেই আছে। বাচ্চাটা হবার আগে কী ভয়ই না হয়েছিল শমিতার! কি হবে উপায়? এই জংলী জগতে একটা ডাক্তার নেই, ধাই নেই; একটা ঝি-ও সহজে পাওয়া যায় না। রামগড় থেকে মা আসতে পারবেন না; মা'র হার্ট আবার খারাপ হয়েছে। কলকাতার মাসি নিজেই হাসপাতালে

আছেন, পেটের ভিতরে একটা টিউমার নিয়ে তাঁরই প্রাণের বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে। ভয় পেয়ে একদিন শমিতাকে কেঁদে ফেলতেই হয়েছিল। আর অপূর্বই সান্ত্বনা দিয়েছিল, ভয় নেই শমিতা, আমি তো কাছে আছি।

কিন্তু অপূর্বর সেই সান্ত্বনায় শমিতার উদ্বেগ একটুও শান্ত হতে পারেনি। অপূর্বকে জানে শমিতা, বেচারা সান্ত্বনা দিতেই জানে; কিন্তু বেচারার হাতে-পায়ে আর মনে সেই জোরই নেই, যে জোরে সান্ত্বনাটাকে কাজে ক'রে দেখিয়ে দিতে পারা যায়। শমিতার নিশ্বাসের কষ্ট দেখে অপূর্বর চোখ ছলছল করেছে। শমিতাই উল্টে সান্ত্বনা দিয়েছে: তুমি ভেব না।

কিন্তু শমিতার মনের সব উদ্বেগ যেন ছেঁড়া-মেঘের মতো ঝড়ের বাতাসে উড়ে চলে গেল সেদিন, যেদিন শান্তনু এক সকাল বেলায় নিজের থেকেই এসে অপূর্বকে সান্ত্বনা দিল—কিচ্ছু ভাবনা করবার নেই। ডাক্তার পাওয়া যাবে, ধাইও পাওয়া যাবে; আর···দরকার হলে আমিও আছি।

হ্যাঁ ঠিকই, ঠিক সময়ে হাজির হয়েছিল শান্তনু। ডাক্তার এসেছিল, ধাইও এসেছিল। আর নিজের হাতে উনোন ধরিয়ে ডাল ভাত আর আলুর দম রান্না করেছিল শান্তনু। অপূর্ব সেদিন ঠিকসময়ে খেতে পেরেছিল, আর কন্‌জারভেটর সাহেবের সঙ্গে কুড়ি মাইল দূরের একটা জঙ্গল তদন্ত করতে বের হতে পেরেছিল। অপূর্বর চাকরির কিংবা ডিউটির কোন সঙ্কট সৃষ্টি হতে পারেনি। রাত্রিবেলা অপূর্ব বাড়ি ফিরে আসামাত্র শান্তনুই আহ্লাদে আটখানা হয়ে আর চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল—সুসংবাদ; তুমি এখন প্রাউড ফাদার অব এ সন!

শুধু সেদিন কেন, তারপর থেকে পুরো পাঁচটি মাস ধরে শান্তনুই এই ঘরের ক্ষুধা-তৃষ্ণার সব দাবির কাজে খেটেছে। সব সময় চাকর

যোগাড় হয় না। যোগাড় হলেও, মাঝে, মাঝে চলে যায়। কিন্তু সে কারণে অপূর্বকে এক মুহূর্তের জন্যও উদ্বিগ্ন হতে হয়নি। দু'বেলা রান্না করেছে শান্তনু ; শমিতাও তার স্নানের জন্য গরম জল ঠিকসময়ে পেয়ে গিয়েছে। শমিতার স্নানের সময় বাচ্চাটা যখন কেঁদেছে, তখন শান্তনুই বাচ্চাটার চোখের সামনে লাল রুমাল নেড়ে বাচ্চাটাকে শান্ত করেছে।

সেদিনের পর এমনি করে আরও কতদিন পার হয়ে গেল। বাচ্চাটারই বয়স এখন দেড় বছর। উলের প্যান্ট আর উলের টুপি পরে বারান্দার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বাচ্চাটা। শান্তনুকে আসতে দেখলেই দু'হাত তুলে নাচতে থাকে। আর শান্তনুও বাচ্চাটাকে দু'হাত দিয়ে লুফে কাঁধের উপর তোলে। চেঁচিয়ে ডাক দেয়—কোথায় আছেন আপনি ?

শমিতা শাড়া দেয়—ভেতরে আসুন।

শান্তনু বলে—না, এখন একবার স্টেশনে যাব।

—কেন ?

—এটার ওজন নিতে হবে, ক'পাউণ্ড হলো।

—কার ওজন ?

—ক্যাপ্টেনের !

ঘরের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে বের হয়ে আসে শমিতা। আর, যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে, দেড় বছর বয়সের ক্যাপ্টেন সত্যিই একটা সুন্দর প্রাণের ভার হয়ে শান্তনুর কাঁধের উপর বসে আছে। কাঁধ নেড়ে, বাচ্চাটার শরীরটাকে নাচিয়ে সত্যিই ওজন বোঝবার চেষ্টা করছে শান্তনু।

সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে শান্তনু বলে—দুপুরবেলা টেম্পারেচার নিয়েছিলেন ?

শমিতা—না।

শান্তনু ভ্রূকুটি করে—এইতো অন্যায় করেছেন। ডাক্তার জানিয়েছেন, সাতদিনের টেম্পারেচারের রিপোর্ট লিখে পাঠালেই একটা টনিক লিখে দেবেন। আপনার ঐ বিশ্রী কাশিটা আর বাড়তে দেওয়া চলে না।

—কাশিটা অনেক কমেছে।

—কমুক; তবু টেম্পারেচার চাই।

এগিয়ে যায় শান্তনু। শমিতা ডাক দেয়—শুনছেন!

শান্তনু—বলুন।

—আপনার বন্ধুর গায়ের আলোয়ানটার ছিরি দেখেছেন?

—দেখেছি। দেখলে ঘেন্না হয়। যেমন তেলচিটে তেমনই কুৎসিত; আজ দেখলাম আলোয়ানটা চোরকাঁটায় ভরা।

—হ্যাঁ, কাল-দুপুরে কোথায় যেন গাছের সেন্সাস নিতে গিয়েছিলেন, আর গাছতলায় আলোয়ানটা পেতে তার ওপর দপ্তর বসিয়েছিলেন।

—কি করতে হবে বলুন?

—আলোয়ানটাকে রাঁচি থেকে একবার ভালো করে ধুইয়ে আর রং করিয়ে···।

—হয়ে যাবে। আলোয়ানটাকে কাগজে মুড়ে আজই বিকেলে আমার সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

—এত তাড়াতাড়ি না করলেও অবিশ্যি চলবে।

—সেজন্যে বলছি না। আজই বিকেলে টু-ডাউনে আমাকে একবার মুরি যেতে হবে। মুরিতে শীতলবাবুর কাছে আলোয়ানটা গছিয়ে দিতে চাই, তাহলেই কাজ হবে।

—শীতলবাবু কে?

—কাপড়ের কারবার করেন। সপ্তাহে একবার-না-একবার তাঁকে রাঁচি যেতেই হয়।

—কিন্তু আপনি আজই বিকেলে মুরি যাবেন কেন?

—না যেয়ে উপায় নেই। আজ একমাসের মধ্যে একটাও ওয়াগন পাইনি। অথচ এদিকে লাইনের তিনটি স্টেশনের তিন ডিপোতে আমার সব ল্যাটারাইট আর ফায়ার-ক্লে আটক হয়ে পড়ে আছে। শুনলাম, আমার আগের চালানের সাতটা মাল-ভর্তি ওয়াগন মুরিতে পড়ে আছে। রহস্যটা ঠিক বুঝতে পারছি না, তাই…।

—ফিরবেন কখন?

—আজ তো নয়ই; হয় কাল, নয় পরশু।

—কিন্তু…

—কি?

সামান্য একটা জিজ্ঞাসা। কি বলতে চায় শমিতা? কিসের কিন্তু? শান্তনু মাত্র একটি বা দুটি দিনের জন্য মহুয়ামিলানের বাইরে থাকবে, সেজন্যে শমিতার জীবনের কি-এমন অসুবিধা হতে পারে?

কিন্তু এই সামান্য একটা জিজ্ঞাসারই উত্তরে শমিতা কি-যেন বলতে গিয়েও আর বলতে পারে না। মুখের ভাষাটা যেন হঠাৎ সাবধান হয়ে নিজেকে সামলে নেয়।

শমিতার মুখে যে সত্যিই একটা অভিযোগের ভাষা ফুটে উঠতে চাইছে, তাহলে কি এই দুটো দিন আমি শুধু একা একা…।

এ-কথার যে কোন মানে হয় না। শান্তনু দুটো দিন মুরিতে থাকলে শমিতার মহুয়ামিলানের জীবন একা-একা হয়ে যাবে কেন? ভাগ্যিস কথাটা বলে ফেলেনি শমিতা। নইলে, শান্তনুবাবু যে শমিতাকে ভয়ানক ভুল বুঝে ফেলতেন। হয়তো আশ্চর্য হয়ে, কিংবা হঠাৎ বুদ্ধি-সুদ্ধি হারিয়ে এমন কথাও বলে ফেলতেন, থাক্ তাহলে, আমার আর মুরি যেয়ে কাজ নেই।

কিন্তু সত্যিই যে শমিতার এই কিন্তুময় আপত্তির প্রাণে একটা যুক্তি আছে। শান্তনু দুটো দিন বাইরে থাকলে, শমিতার ঘরের

যত কাজের দরকারের আর ইচ্ছার দাবিগুলিকে মিটিয়ে দেবার দায় নেবে কে? ভগবান না করুন, ছেলেটার গায়ে হঠাৎ যদি জ্বর দেখা দেয়, তখন জ্বর সারাবার সব দায় আর ঝঞ্ঝাট নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে শমিতাকে দুপুরবেলাতে একটু ঘুমিয়ে নেবার সুযোগ করে দেবে কে? অপূর্ব আজকাল গরম জলে স্নান করে; কিন্তু গরম জলের বড় হাঁড়িটা উনোনের উপর থেকে নামাতে হলে যে শান্তনুকেই ডাকতে হয়। শান্তনু এসে জলভারে এত ভারী হাঁড়িটাকে নামিয়ে দেয় বলেই একটা বিপদের আশঙ্কা থেকে বেঁচে যায় শমিতা। গরম জলের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে একদিন শমিতার হাত হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল, আর ছলাক্ করে জল উথলে পড়েছিল; শমিতার হাতে তিনটে ফোস্কাও পড়েছিল। বেশ কয়েকটা দিন ধরে ফোস্কার ক্ষতের জ্বালা সহ্য করতে হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে গরম জলের হাঁড়ি টানাটানি করতে সাহস করেনি শমিতা। শান্তনুই শমিতাকে সে সাহস করতে দেয়নি। শান্তনু যেন শমিতার এই সংসারের ছোট্ট একটা দুর্ঘটনার ফোস্কার জ্বালাকেও নিজের উপর টেনে নিতে চায়।

শমিতা বলে—না, কিছু নয়।

চলে যায় শান্তনু।

জয়গড় নামে জায়গাটার কাছে একটা জঙ্গলের ধারে শান্তনুর জীবনের সেই তাঁবু আজও আছে। আজকাল জয়গড়ের নিকটেই কোন্ এক পাহাড়ের কাছে পাথর ভাঙছে শান্তনুর কুলীর দল। মহুয়ামিলানের ফরেস্ট-রেঞ্জারের এই কোয়ার্টারের ঘরের ভিতরে বসে শুনতে পাওয়া যায়, দূরের আকাশের কোলে যেন দুম্ করে একটা গম্ভীর শব্দের গোলা আছড়ে পড়লো। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ব্লাস্ট করছে শান্তনুবাবুর অদ্ভুত পাথুরে কারবারের একটা আওয়াজ-সরদার। মাঝে মাঝে এই ঘরের জানালা দিয়ে দূরের আকাশের

দিকে তাকাতে গিয়ে শমিতার চোখ-দুটোও অদ্ভুত রকমের একটা হাসির আবেশে ভরে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁবু থেকে বের হয়ে পড়েছেন শান্তনুবাবু; বোধহয় চন্দ্রপুরা রোডের পুলটার কাছে পৌঁছে যেতে পেরেছেন। পারবেনই বা না কেন? সাইকেল আস্তে চালানো শান্তনুবাবুর অভ্যাসই নয়।

সকালের চায়ের জল স্টোভের উপর চাপিয়ে দেবার পর, লেসের কাঁটা হাতে নিয়ে জানালাটার কাছে চুপ করে বসবার আর দূর আকাশটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকাবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়, যদি ছেলেটা বিরক্ত না ক'রে নিজের মনে খেলা করে। অপূর্ব তখনো বিছানার উপর পড়ে থাকে। চা তৈরি না হবার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবেই না অপূর্ব।

হঠাৎ নিকটেরই বাতাসে ক্রিং ক'রে সাইকেলের ঘন্টি বেজে ওঠে। 'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!'—শান্তনুর ব্যস্ত আহ্বানের শব্দও যেন সকালবেলার নীরব বাতাসে একটা মুখর সুখের উল্লাস উথলে দিতে থাকে। ছেলেটা ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বাইরে চলে যায়।

পরমুহূর্তে ক্যাপ্টেনকে কাঁধে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকে শান্তনু। শান্তনুর মুখের প্রথম প্রশ্ন হলো সেই একই প্রশ্ন—কি ব্যাপার? অপূর্বর কি এখনও চা খাওয়া হয়নি?

শমিতা—না।

শান্তনু—কেন?

শমিতা—আপনারই অপেক্ষায়…

শান্তনু—আমার অপেক্ষা করবার কি কোন মানে হয়?…যাক্, কই, চা কোথায়?…ওঠ হে অপূর্বচন্দ্র!

অপূর্বর নিদ্রাকাতর শরীরটাকে জোরে একটা ঠেলা দিয়েই পকেট থেকে একটা আপেল বের করে শান্তনু।—পি-ডব্লু-আই ভদ্রলোক সত্যিই ভদ্রলোক। কথায় কথায় একবার আপেলের কথা

বলেছিলাম। লাতেহার বাজারে অনেক খোঁজ করে মাত্র একটি আপেল পেয়েছেন, আর গার্ডের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শমিতা যেন একটা সূক্ষ্ম ঠাট্টার স্বর চেপে মৃদুভাবে হাসে—হঠাৎ আপেলের শখ হলো কেন ?

এগিয়ে যেয়ে টেবিলের উপর থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে আপেল কাটে শান্তনু। ক্যাপ্টেনকে কোলের ওপর বসিয়ে, কাটা আপেলের একটা টুকরো ক্যাপ্টেনের মুখে তুলে দিয়েই বলে—হঠাৎ একদিন মনে হলো, আমাদের ক্যাপ্টেনকে মাঝে মাঝে আপেল খাওয়ানো দরকার।

শমিতার চোখ-দুটো হঠাৎ চম্‌কে ওঠে। যেন একটা নিবিড় বিস্ময়ের চমক। একটা মূর্খ ধারণার অপরাধের চমক। শান্তনু বাবু যে এত চেষ্টা করে নিজের খাওয়ার জন্য আপেল যোগাড় করতে পারেন, এমন ধারণার চেয়ে ছোট মনের ধারণা আর কি-ই বা হতে পারে ? শান্তনুর জন্যে নয় ; যার জন্যে আপেল এনেছে শান্তনু, সে এরই মধ্যে গাল ভরে আপেলের টুকরো চিবোতে শুরু করে দিয়েছে।

ছেলেটাও কী ভয়ানক স্বার্থলোভী চতুর। শান্তনুর কোলের উপর বসে যেন ধন্য হয়ে আদরের আপেল খাচ্ছে।

চা খেয়ে আবার সাইকেল ছুটিয়ে চলে যায় শান্তনু। কোথায় যায় কে জানে! দিগ্বিদিকে যত জঙ্গলের বুকে, নদীর চটানে আর পাহাড়ের গায়ে ওর যত ইজারাবন্দী পাথর ওকে ডাকছে, সেটা অবশ্য অজানা নয় শমিতার। যাই হোক, এত কারবারী ব্যস্ততার মধ্যেও যে শান্তনু এখানে এসে দিনের বেলার খাওয়াটুকু খেয়ে যেতে ভুলে যায় না, এটুকুও শান্তনুর পক্ষে যথেষ্ট ভদ্রতা বলা যায়।

কিন্তু এখানে এসে খেয়ে যাবার জন্য সত্যিই কি কোন সাধ আছে শান্তনুর মনে ? দেখে তো মনে হয় না, শমিতার এই ঘরোয়া সুখের ছায়ার কাছে এসে দাঁড়াবার আর শ্রান্তির জীবনটাকে একটু

ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য শান্তনুর কোন আগ্রহ আছে। নিজের দরকারে নয়; এই ঘরের দরকারেই ছুটে আসে শান্তনু। খেতে আসে বললেই বরং ভুল বলা হয়। শান্তনুর ভাবনার যত ব্যস্ততার রকমটাও এই সন্দেহ ধরিয়ে দেয় যে, যেন খাওয়াতেই আসে শান্তনু। অপূর্ব তো সকাল ন'টা বাজতেই খাওয়া সেরে নিয়ে অফিস-ঘরের দিকে চলে যায়। নয়তো, দূরের কোন রিজার্ভ-এরিয়ার দিকে। শান্তনু আসে বেলা বারোটা কিংবা একটায়; এসেই, সব কথার আগে সেই কথাটাই বলে -- আপনার খাওয়া হয়েছে তো?

বিরক্ত হয় শান্তনু, যখন শুনতে পায় যে শমিতা তখনো খায়নি। —এটা ভয়ানক অন্যায়। এতক্ষণ না-খেয়ে থাকা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ, খুব ক্ষতি হতে পারে। ক্যাপ্টেন আর একটু বড় হোক, তার পর না হয়…।

খাওয়া সেরে নিয়েও যতক্ষণ থাকে শান্তনু, ততক্ষণ শান্তনুর চিন্তাটাও যেন ব্যস্ত হয়ে থাকে। হাত-দুটোও। ফিরোবার কোন চেষ্টা নেই, ইচ্ছাও নেই শান্তনুর। শমিতা যে জবার চারাটা পুঁতেছে, সেটার গোড়ায় জল ঢেলে দিয়ে আসে শান্তনু। খোঁজ নেয়, হরিয়ার মা এবেলা কাজ করতে এসেছিল কিনা? জানতে চায় শান্তনু, ভালো সর্ষের তেল পেতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

দুটো খাটের দুটো বিছানার দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিয়েই কি-যেন বুঝতে পারে শান্তনু। বিড়বিড় করে,—বিছানার বালিশ আর তোষক বোধহয় অনেকদিন রোদে দেওয়া হয়নি।

শমিতা—না। তোষক দুটো যা ভারী, তুলতে আমার একটু…।

শান্তনু—একটু কেন, বেশ কষ্ট হবেই তো। সেই সন্দেহই করছিলাম…যাক্, সাবধান, আপনি কিন্তু এসব ভারী জিনিষ টানা-টানি করবেন না।

বলতে বলতে খাটের উপর থেকে তোষক আর বালিশের একটা

স্তূপ দু-হাতে জড়িয়ে আর কাঁধের উপর তুলে নিয়ে উঠোনের দিকে চলে যায় শান্তনু।

সন্ধ্যাবেলাতেও আসে শান্তনু। মাঝে মাঝে রাতের খাওয়াও এখানেই সেরে নেয়। আর, শমিতার খাওয়া সারা না হওয়া পর্যন্ত, রাত যতই ঘনিয়ে উঠুক না কেন, এই রকমই ব্যস্ততা চিন্তা আর তাগিদের হাঁকডাক করবার জন্য এখানেই বসে থাকে।

তারপর সেই শান্ত ও থমথমে মুহূর্তও দেখা দেয়, যখন শমিতা একেবারে নীরব হয়ে যায়; কোন কথাই বলে না। বাইরের মাঠের উপর অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাকের শব্দটাও তখন যেন একটা স্বপ্নালু বেদনার ভারে নিঝুম হয়ে আসতে থাকে।

—রাত্রিবেলা কখন জাগে ক্যাপ্টেন? চাপা গলায় খুবই মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে শান্তনু, যেন ক্যাপ্টেনের ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

শান্তনুর প্রশ্নের আর উত্তর দেয় না শমিতা। শমিতার কথা বলবার শক্তিটাও যেন নিঝুম হয়ে আসতে থাকে।

—ক্যাপ্টেনের ফুড আছে তো? আবার প্রশ্ন করে শান্তনু; আর শমিতার মুখের কোন জবাবের জন্য একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে দেয়ালের তাকের কাছে এগিয়ে যেয়ে ফুডের শিশিটার দিকে তাকায়। —আছে দেখছি; এখনও চারটে দিন চলবে বোধহয়।

তারপর আর একমুহূর্তও নয়। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বাইরের বারান্দা, তার পর এই ঘরোয়া সুখের নীড়ের ছোঁয়া থেকে একেবারে বাইরে, সড়কের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সাইকেল ছুটিয়ে জয়গড়ের একটি জংলা নিরালার দিকে, যেখানে শান্তনুর তাঁবুর ভিতরে একটি কোণে একটা ধোঁয়াটে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, সেই দিকে উধাও হয়ে যায় শান্তনু।

মহুয়ামিলানের এই তিনবছরের জল-বাতাসের স্নেহে আর যত্নে শমিতার ঘরের প্রাণ সুখী হতে পেরেছে। এই তিনবছরের মধ্যে অন্তত

দশবার অপূর্বকে কিসমিসের পায়েস খাওয়াতে পেরেছে শমিতা। কোন চিন্তা করতে হয়নি, একটুও আক্ষেপ করতে হয়নি। শমিতার ইচ্ছার কথাটা জানতে পেরে শান্তনুই সব দরকারের জিনিস এনে দিয়েছে।

অপূর্বর জলবসন্ত হয়েছিল যখন, তখনও, শমিতাকে রোগীর সেবার কোন কাজ করতে দেয়নি শান্তনু। —আপনি ক্যাপ্টেনকে নিয়ে ও-ঘরে থাকুন। অপূর্বকে আমিই স্নান করিয়ে দিচ্ছি।

শমিতার জীবনের সব উদ্বেগের দায় শান্তনু যেন নিজের এই পাথর-ভাঙা ব্যস্ত জীবনেরই উপর নতুন একটা সাধের দায়ের মতো চাপিয়ে দিয়েছে।

এসব অদ্ভুত সত্যের কিছু কিছু খবর নিশ্চয় চিন্তামণিবাবুর স্ত্রীও রাখেন; ষ্টেশনের মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী বোধহয় কিছু বেশি খবর রাখেন। তা না হলে গল্প করতে করতে দুজনে সেদিন এত আশ্চর্য হবেনই বা কেন।—তিন বছরের মধ্যে বউটা একবার বাপের বাড়ি গেল না, কি আশ্চর্য!

—পাথরবাবুই বোধহয় যেতে দেয় না।

—না না, উনি বললেন; বউটা নিজেই ইচ্ছে ক'রে যায় না।

—কেন? পাথরবাবুর কষ্ট হবে বলে?

—তা কি করে বলবো দিদি? বিশ্বাস করতেও যে ইচ্ছে হয় না।

—আবার অবিশ্বাস করতেও যে ইচ্ছে হয় না।

—তা সত্যি। তবে কিনা…।

—কি?

—দ্রৌপদী যদি পঞ্চস্বামী নিয়ে ঘর করতে পারে, তবে কলিকালে দু'টি স্বামী নিয়ে…তবু, ছিঃ, ভাবতে একটু লজ্জাই লাগে।

—প্রথম যখন এল, তখন দেখেছিলাম, কত ঢং ক'রে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে। উনি বললেন, মুনিকন্যাদের মতো

স্বামীর সঙ্গে ঝরণার ধারে বসে বনের হরিণ দেখবার নাকি সাধ হয়েছিল মেয়েটার। জঙ্গলবাবুকে একটু বেহায়া বলতে হয়, নিজেই এসব গল্প ওঁর কাছে বলেছে।

—কিন্তু তারপর, কই···আর তো—

—না, আর কই? আর কোনদিনও তো দেখলাম না যে, স্বামীর হাত ধরে আর চাঁদের দিকে তাকিয়ে ঘুরে বেড়াবার কোন সাধ আছে। ঘরের বাইরেই বের হয় না। কিন্তু মনে আছে তো, একসের সোডার জন্যে তাগিদ দিতে কতবার আমার এখানে এসেছিল?

—খুব মনে আছে। কিন্তু এখন তো আর সে-দুশ্চিন্তে নেই। পাথরবাবু এসে একেবারে নিশ্চিন্তি করে দিয়েছে।

—কিন্তু সে-মানুষটারই বা কোন্ স্বার্থ?

—ও-কথা জিজ্ঞেস করলে আবার তো সেই বিশ্রী সন্দেহ করতে হয়।

—কিন্তু শুনেছি, পাথরবাবু লোকটার তবু একটু চক্ষুলজ্জা আছে। রেঞ্জারের বাড়িতে এসে সারাক্ষণ যতই উৎপাত করুক না কেন, রাত্তির-বাস করে না।

—বেচারা!

—আপনি হাসছেন যে?

—হাসছি বটে, কিন্তু সত্যি একটু দুঃখও হয়।

—কার জন্যে?

—ঐ পাথরবাবুটার জন্যে। তাঁবুতে ছিলি, ভালোই ছিলি, মিছে কেন পরের ঘরের উপর-লোভ ক'রে···।

একটু ভুল অভিযোগ করেছেন চিন্তামণিবাবুর স্ত্রী। শমিতার মনে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আর স্বামীর হাত ধরে বেড়াবার সাধটা মরে যায়নি। অপূর্বর কল্পনার প্রোগ্রামগুলিও এই তিনবছরের মধ্যে

যে নীরব হয়ে গিয়েছিল, তাও নয়। কান্তি-নির্ঝরে বেড়াতে যাবার জন্য একটা দুর্বার আশার উল্লাস এই সেদিনও অপূর্বর কথায় কত মুখর হয়ে উঠেছিল।—না, আর দেরি করা চলে না, শমিতা। এবার দুটি দিনের জন্য সব কাজ-টাজ বন্ধ রেখে, চল বেরিয়ে পড়ি। আমঝরিয়ার ফরেস্ট-বাংলোতে বেশ স্বচ্ছন্দে একটি দিন থাকা যাবে। ব্লক-ডেভলপমেণ্টের নরেশবাবুর সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছে। উনি বলেছেন, তাঁর জীপটা দু'দিনের জন্যে ছেড়ে দেবেন। সুতরাং, আর অসুবিধের কিছু নেই।

শমিতা আনমনার মতো বলে—তবে ছাখো চেষ্টা ক'রে।

—কিন্তু তোমার তো কোন চাড় দেখছি না। দিনরাত শুধু ঘর নিয়ে আর ঘরের কাজ নিয়ে ঘুটুর-ঘুটুর করছো। যেন রান্না, শেলাই আর বিছানা রোদে দেওয়াই জীবনের সার্থকতা!

হেসে ফেলে শমিতা—আমি কি কোনদিন এ-কথা বলেছি?

—মুখে না বললেও, কাজে ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছ।

—কেন বাজে-কথা বলছো?

আজকের বিকেলটা অবশ্য বেড়াতে যাবার বিকেল হিসাবে সুবিধার নয়। মাঝে মাঝে হাল্‌কা মেঘের প্রলেপে সূর্যটা ঢাকা পড়ছে। রোদের তাত মাঝে মাঝে বেশ মিইয়ে যাচ্ছে, বাতাসটাও ঠাণ্ডা হয়ে সিরসিরিয়ে উঠছে।

কিন্তু এসময়ে ক্যাপ্টেনকে ঘরের ভিতরে আটক করে রাখবার সাধ্যি শমিতার নেই। ঘরের বাইরে যাবার জন্য ছটফট করে ছেলেটা। বার বার ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে ছেলেটা বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়। ফটকের দিকে তাকায়। দূরের সড়কের দিকেও তাকায়।

কিসের জন্য আর কার জন্য ছেলেটার এই ছটফটে ব্যস্ততা, সেটা শমিতার অজানা নয়। রোজই এই সময়ে আসে শান্তনু।

এসেই ক্যাপটেনকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হয়ে যায়। এইটুকু ছেলেটার বুদ্ধির ভিতরে যেন ঘড়ির কাঁটা আছে। ঠিক পাঁচটা বাজলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ছোট্ট জুতো জোড়া দু'হাতে তুলে নিয়ে আর লাফাতে লাফাতে শমিতার কাছে ছুটে আসে। বেড়াতে যাবার জামা আর প্যান্ট পরে, জুতো পায়ে দিয়ে আর মাথায় টুপি পরে প্রস্তুত হতে চায় ছেলেটা। শমিতাও দেরি করে না। ক্যাপটেনকে জামা পরিয়ে, চুল আঁচড়ে দিয়ে আর চোখে কাজল বুলিয়ে দিয়ে শমিতাও বিকেলবেলার একটা নিয়মিত কর্তব্য ব্যস্তভাবে সেরে দিতে ভুলে যায় না।

ফটকের কাছে একটা সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শোনবার জন্য ছেলেটার প্রাণ যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। শমিতা জানে, আর দেরি করা উচিত নয়; এখনই এসে পড়বে শান্তনু; আর এসেই যদি দেখতে পায় যে, ক্যাপটেনের সাজ সারা হয়নি, তবে বেশ বিরক্ত হয়ে বলে ফেলবে শান্তনু—বাঃ, আপনি দেখছি খুব কাজের মানুষ।

এক একদিন ক্যাপটেনের মাথাটার দিকে তাকিয়েও শান্তনু বিরক্ত হয়ে ওঠে।—এরকম বিশ্রী করে আর এত শক্ত একটা ঝুঁটি বেঁধে দিয়েছেন কেন? একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

শান্তনু নিজেই চিরুণী হাতে নিয়ে এগিয়ে যায়। ক্যাপটেনের চুলের শক্ত ঝুঁটি খুলে দিয়ে, আর আস্তে আস্তে চিরুণী বুলিয়ে ক্যাপটেনের মাথার রেশমের স্তূপের মত নরম চুলগুলিকে ঢেউ খেলিয়ে দেয়।

আজ পাঁচটা বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। ক্যাপটেনকে অনেকক্ষণ আগেই সাজিয়ে দিয়েছে শমিতা। কিন্তু ঘরের বাইরে বারান্দার উপরে যেন হরিয়ার মা'র চিৎকার আর ক্যাপটেনের গলার একটা দুরন্ত আপত্তির আক্রোশময় শব্দের সংঘর্ষ বেধেছে। চমকে ওঠে শমিতা। অপূর্ব আশ্চর্য হয়—কি হলো?

শমিতা যেন বিরক্ত হয়ে মুখ ভার করে আর গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়।—তুমি বুঝবে কি করে, কি হলো?

সত্যিই অপূর্বর বুঝবার সাধ্যি নেই; কেনই বা ক্যাপটেনের সঙ্গে হরিয়ার মা'র এই চিৎকারময় সংঘর্ষ? আর কেনই বা শমিতার এরকম মুখভার করে কথা বলা?

ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায় শমিতা। বার বার আদরের সুরে মিষ্টি কথা বলে ক্যাপটেনকে শান্ত করতে চেষ্টা করে।—যাও বাবু, হরিয়ার মার সঙ্গে বেড়িয়ে এস। ঘুঘু পাখি দেখে এস। হরিয়ার মা তোমাকে ফুল দেবে, সুন্দর লাল লাল ফুল।

কিন্তু ক্যাপটেন যেন শমিতার এই আদরভরা অনুরোধের কথাগুলিকে ধূর্ত একটা ছলনা বলে মনে করে। হরিয়ার মা'র সঙ্গে বেড়াতে যেতে রাজি হয় না ক্যাপটেন।

কোন সন্দেহ নেই, শান্তনুকে খুঁজছে ক্যাপটেন। শান্তনু ছাড়া আর কারও সঙ্গে বেড়াতে যেতে ক্যাপটেনের কচি মুখেও কোন আহ্লাদ জাগে না। বুঝতে অসুবিধা নেই শমিতার, ছেলেটার অভ্যেস খারাপ করে দিয়েছেন শান্তনু বাবু।

অথচ আজ তিনি আসবেন না। কালও আসবেন না। গত কালই বলে গিয়েছেন, কাজের দায়ে কোথায় যেন যেতে হবে। কোন্ এক গাঁয়ে গিয়ে নতুন কুলি নাকি যোগাড় করতে হবে।

বোধহয় বুঝতেই ভুলে গিয়েছে শমিতা, এই ঘরের বাইরেও শান্তনুর কোন কাজ থাকতে পারে; আর, সে কাজটা শান্তনুর জীবনের কম জরুরী কাজ নয়।

ভারী কাজ! ছেলেটা যে আশায় আশায় ছট্‌ফট করছে, এসময়ে ওকে একবার বেড়াতে নিয়ে না গেলে কান্নাকাটি করে, এটা তো ভদ্রলোকের কাছে অজানা ব্যাপার নয়। কিন্তু কত সহজে একটা মায়ার কাজ অনায়াসে তুচ্ছ করে কুলি খোঁজার কাজে চলে

গেলেন ভদ্রলোক। একবারও ভেবে দেখলেন না যে, শমিতার উপর কি রকম একটা ঝঞ্ঝাট চাপিয়ে দিয়ে গেলেন।

অপূর্বও কাছে এসে দাঁড়ায়।—কি ব্যাপার?

শমিতা—ক্যাপটেনের মরজি।

—কিসের মরজি?

—হরিয়ার মা'র সঙ্গে বেড়াতে যাবে না।

—তবে কার সঙ্গে যাবে?

—যার সঙ্গে যেতে চায়, তার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে?

—কি বললে?

—বলছি তোমার বন্ধুটির কথা। কোথায় কোন্ গাঁয়ে কুলি খুঁজতে গিয়েছেন। দু'দিন এদিকে আসবেন না। অথচ একবার ভেবে দেখলেন না যে....।

—আজ না হয় বেড়াতে না-ই গেল ক্যাপটেন।

—সে-কথা তুমি না বললেও চলবে।

হরিয়ার মা'র দিকে তাকিয়ে রুক্ষস্বরে কথা বলে শমিতা—ছেড়ে দাও হরিয়ার মা। তুমি অন্য কাজ কর।

হরিয়ার মা চলে যায়। ক্যাপটেন দৌড়ে গিয়ে ফটকের কাছে দাঁড়ায় আর সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শমিতার গম্ভীর বিরক্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে অপূর্ব বলে।—শান্তনুর দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে বেচারার নিজের কাজও তো আছে।

শমিতা—তুমি কি এখন অফিসে যাবে?

—না।

—তবে?

—তবে...কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

শমিতার চোখে যেন ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি শিউরে উঠে—বই-টই পড়.তা'হলে।

অপূর্ব—তার চেয়ে বরং···!

—কি ?

শমিতার একটা হাত ধরে অপূর্ব হাসে।—এস, একটু মন খুলে গল্প-টল্প করি।

শমিতাও হেসে ফেলে।—শুধু গল্প করেই কি পেট ভরবে? চা-টা খাবে না?

অপূর্ব—নিশ্চয়। তুমি চা তৈরী কর। সেই সঙ্গে গল্পও করা যাক।

শমিতা মুখ টিপে হাসে।—পুরনো গল্প বললে কিন্তু শুনবো না।

ঘরের ভিতরে ঢুকে স্টোভ ধরায় শমিতা। অপূর্ব বলে—তোমার হাতের চা আমি প্রথম কবে খেয়েছিলাম, বলতে পার?

শমিতা—খুবই পুরনো গল্প হয়ে গেল।

—তার মানে ?

—একথাটা এর আগে পঁচিশ বার বলেছ।

—বলেছি বোধহয়; কিন্তু মনে নেই। যাই হোক, এ গল্প কিন্তু পুরনো হয় না শমিতা।

—কেন ?

—এখনও কি মনে হচ্ছে জান ?

—কি ?

—মনে হচ্ছে, আজ এই প্রথম তুমি আমার জন্য নিজের হাতে চা তৈরী করছো। তুমি ঠিক সেই রকমটিই আছ, বিয়ের আগে সেই যে তোমাদের রামগড়ের বাড়ির বাইরের ঘরে যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম।

—ভুল বললে। আমি বাইরের ঘরে ঢুকিই নি।

—আঃ, একই কথা হলো। আমি বাইরের ঘরে বসে দেখেছিলাম, তুমি বারান্দার এক কোণে বসে চা তৈরী করছো।

-তাই বল

হঠাৎ খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অপূর্ব।—একি? চমৎকার কাপ আর পট। জাপানী সেট বলে মনে হচ্ছে।

শমিতা—আজ চোখে পড়লো?

অপূর্ব—তাইতো; আগে কখনও তো দেখিনি?

শমিতা—এক মাস হলো এই জাপানী সেট ব্যবহার করা হচ্ছে। তবু চোখে পড়েনি? বেশ!

অপূর্ব—কোথা থেকে পেলে?

—শান্তনু বাবুকে বলেছিলাম; উনি এক ঠিকেদারের ছেলেকে বলে পাটনা থেকে আনিয়ে দিয়েছেন।

—আশ্চর্য; শান্তনুটা পারেও এত ঝঞ্ঝাট সইতে। আর...।

—কি?

—শুধু পরের জন্য ঝঞ্ঝাট সহ্য করে দেখছি। নিজের জন্য একটুও না।

—তার মানে?

—তার মানে, নিজে চা খায় একটা ভাঙা পেয়ালায়।

—মাঝে একদিন জঙ্গল দেখতে জয়গড়ের দিকে গিয়েছিলাম। শান্তনুর তাঁবু দেখলাম।

—কবে গিয়েছিলে? কি দেখলে? চা ছাঁকতে গিয়ে শমিতার হাতটা যেন হঠাৎ উল্লাসে চমকে উঠে।

অপূর্ব—দেখলাম, তাঁবুতে একটা জংলী ছোঁড়া উনুনের কাছে বসে শুধু ভাত ফোটাচ্ছে।

শমিতা—শুধু ভাত?

—স্রেফ ভাত। না ডাল, না তরকারী। হ্যাঁ...এক শিশি ঘি আছে দেখলাম। ছোঁড়াটা বললে, বাবু আলু পোড়াও খায়। ভাত ঘি আর আলুপোড়া, বাস্।

শমিতার চোখে-মুখে যেন একটা দুঃসহ করুণার ছায়া ছম্‌ছম করে।—তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে যে এত গল্প করলে···কিন্তু কই···।

—কিসের গল্প ?

—শুনলাম কত তিতির মেরে মাংস খাবে ; মৌরলা মাছ ধরবে। সে-সব সাধ গেল কোথায় ?

—সাধ তো অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু সময় হচ্ছে কোথায় ?

—শান্তনু বাবুর তো সময় আছে। উনি তো ইচ্ছে করলে শিকার-টিকার করে রোজই মাংস-ভাত খেতে পারেন।

—নিজের জন্য এত ঝঞ্ঝাট সহ্য করবে শান্তনু ? তাহলেই হয়েছে। তবে আর বলছি কি ? তুমিই বা কি বুঝলে ? শান্তনু তোমার জন্যে জাপানী টী-সেট আনিয়ে দিয়েছে ; অথচ ওর নিজের জন্য কি রেখেছে জান ?

—শুনলাম তো ?

—হ্যাঁ, একটা হাতলভাঙ্গা আর ফাট-ফাটা চীনে মাটির নোংরা পেয়ালা তাঁবুর এক কোণে পড়ে আছে। তা ছাড়া···।

—কি ?

—কাল একটা অদ্ভুত কথা বললে শান্তনু।

—কি বললেন ?

—স্টেশনের মাস্টার মশাই এক জোড়া হরিয়াল ঘুঘু শান্তনুকে দিয়েছিলেন।

—কেন ?

—আদা আর রসুন-দিয়ে হরিয়াল ভাজা খেতে কি চমৎকার লাগে, জান ?

—না।

—যাই হোক, শান্তনু কিন্তু সেই ঘুঘুজোড়া নিতে রাজি হলো না। বললে, মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন ?

—জিজ্ঞেস করেছিলাম। শান্তনু বললে, শিকার করে পাখি, খরগোস আর হরিণ মারতে, কিংবা মাংস খেতে শান্তনুর আর রুচি নেই।

—কেন রুচি নেই ? ওরকম একটি হট্টকট্টা পাথুরে মানুষের আবার এরকম নিরামিষী মায়া কেন ?

—সেই কথাই তো বলছি। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। শান্তনু বললে, ক্যাপটেনটা হবার পর থেকে ওর মনটা কেন যেন বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছে। শিকার ছেড়েছে, মাংস খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে।

অপূর্বর হাতের কাছে চা-এর কাপ এগিয়ে দিতে গিয়েই শমিতার চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে, তারপরেই যেন ঘুমন্ত মানুষের চোখের মত একটা আবেশের ভারে বুঁজে যেতে থাকে! অপূর্ব হাসছে, সে হাসির শব্দ শমিতা যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে অপূর্ব বলে—শান্তনুটা চা তৈরী করতে খুব এক্সপার্ট। তোমার চা'ও প্রায় শান্তনুর হাতের চায়ের মত হয়েছে।

নিজের মনের খুশিতে আর সেই খুশিরই উৎসাহে আরও কত প্রশ্নই না করতে থাকে অপূর্ব। কিন্তু শমিতা সে-সব প্রশ্নের কোন শব্দ শুনতে পায় কিনা সন্দেহ। অপূর্ব হঠাৎ বেশ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —কিছুই শুনতে পাচ্ছ না বলে মনে হচ্ছে।

শমিতা—কি বললে ?

অপূর্ব—বলছি, ধ্যান করছো বলে মনে হচ্ছে।

হেসে ফেলে শমিতা। —ধ্যান ট্যান নয়; ভাবছিলাম, তোমার বন্ধুটি একটু কম ন্যাকা হলেই ভাল হতো।

অপূর্ব—তার মানে ?

শমিতা—তার মানে, মুখে যতটা বন্ধু-প্রীতি দেখান, কাজে ততটা…।

অপূর্ব বাধা দিয়ে বলে—কেন মিছে বেচারাকে নিন্দে করছো? শান্তনু আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছে, এখনও করছে। আর কত করবে? আর তোমাকেও বলি…।

কথার মাঝখানে অপূর্ব হঠাৎ থেমে যায়; শমিতা তাই জিজ্ঞেস করে; —কি বলছো?

অপূর্ব—আমার ভয় হয়, শান্তনুকে তুমি বোধহয় ভুল করে একদিন কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। সেটা খুবই অন্যায় হবে শমিতা।

হেসে ফেলে শমিতা। —তোমার মনে এরকম ভয় আবার কেন দেখা দিল?

অপূর্ব—আজ, এইমাত্র; তোমার কথা শুনে মনে হলো, শান্তনুর উপর তুমি বিরক্ত হয়েছ। অথচ…।

শমিতা—কি?

অপূর্ব—শান্তনুর উপর বিরক্ত হবার কোন অধিকার তোমার নেই, আমারও নেই। আমরা ওর কোন উপকার করিনি, ওই আমাদের অনেক উপকার করেছে।

শমিতা গম্ভীর হয়ে বলে—একথা আমাকে না বললেও চলতো; আমি এমন পাগল নই যে,…

অপূর্ব হাসে—আমি ভুলের কথা বলছি, শমিতা। সব বুঝে সুঝেও তুমি যদি হঠাৎ ভুল করে আর বিরক্ত হয়ে শান্তনুকে কোন কটূকথা শুনিয়ে দাও, তবে সেটা খুবই অন্যায় হবে।

শমিতা বিরক্ত হয়ে বলে—বেশ তো, প্রতিজ্ঞা করছি; ভুল হবে না।

কুলি যোগাড় করতে একটা গাঁয়ে নয়, কয়েকটা গাঁয়ে গিয়েছিল শান্তনু। দু'দিন পরে ফেরার কথা থাকলেও দু'দিন পরে ফিরতে পারেনি শান্তনু। ফিরেছে পুরো সাতটা দিন পার করে দেবার পর।

শমিতার সংসারের যত পরিপাটি শৃঙ্খলা, স্বাচ্ছন্দ্য, পরিচ্ছন্নতা আর সুশ্রীতা যেন এই সাতটা দিন ধরে ক্ষণে ক্ষণে আর্তনাদ করেছে। জবার গাছটাতে এই সাতদিন একফোঁটা জল পড়েনি। ক্যাপটেন একবার আছাড় খেয়ে পড়েছে আর ভুরুর কাছে একটা জখমও হয়েছে। কিন্তু ঘরে আইডিন ছিল না; আইডিন যোগাড় করতেও পারেনি শমিতা। আইডিন নেই—শমিতার চিঠি নিয়ে হরিয়ার মা দু'বার স্টেশনের মাষ্টার মশাই-এর কাছে গিয়েছিল। কিন্তু মাষ্টার মশাই আইডিন দিতে পারেন নি; কারণ আইডিন ছিল না।

ঘরের ভিতরের বারান্দাটা এরই মধ্যে নানা জঞ্জালে ভরে গিয়েছে। শুকনো পাতা, কাদার দাগ, আর এলোমেলো করে ছড়ানো যত চা-এর বাসন, আসন আর ময়লা কাপড়-চোপড়। জলের কুঁজোটাকেও ভেঙ্গে দিয়েছে ক্যাপ্টেন। সেই ভাঙ্গা কুঁজোর টুকরোগুলি বারান্দার উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে।

হরিয়ার মা রাগ করে বলে—আমি দুটো হাতে এতটা কাজ করবো কি করে? জল তুলবো, আর বাসন মাজবো, না তোমার দাওয়াইয়ের জন্য দৌড়বো আর বারন্দা ঝাড়ু দেব?

সাতদিন ধরে শমিতাকে সত্যিই বেশ হয়রানি ভুগতে হয়েছে। সোডার জল দিয়ে বারান্দাটাকে ধুয়ে দিতে চেয়েছিল শমিতা; কিন্তু সোডার শিশিটা খুঁজেই পায় নি। কয়লা ফুরিয়ে গিয়েছিল; আর হরিয়ার মা'ও দুদিন কামাই করেছিল। কাজেই, কাঠের আগুনে রান্না করতে হয়েছে। কাঠও সেই রকমের অদ্ভুত কাঠ। পুরনো একটা শালের গুঁড়ি উঠানের এক কোণে পড়েছিল। কাটারি হাতে নিয়ে আর দু'ঘণ্টা ধরে কুপিয়ে কুপিয়ে সেই গুঁড়ির এক গাদা চেলা খুলেছে শমিতা; তবে রান্না হয়েছে; হাতে দুটো ফোস্কাও পড়েছে; ফোস্কার জ্বালা শান্ত করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতেও হয়েছে।

চিনি ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই সকালবেলা অপূর্বর জন্য সুজির হালুয়া তৈরী করতে পারেনি শমিতা। আরও দুঃসহ শাস্তি, অপূর্ব হেসে হেসে সেই বিনা চিনিতে তৈরি চা খেয়ে অফিসে চলে গেল।

দুপুর হবার আগেই অফিসের কাজ সেরে ঘরে ফিরে আসে অপূর্ব। আর ঘরে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে যায়।

শান্তনু এসেছে ; ঘরের ভেতরে ব্যস্তভাবে ঘুরে ফিরে কাজ করছে ; আর শমিতা ভিতরের ঘরে চেয়ারের উপরে গম্ভীর হয়ে বসে আছে।

শান্তনু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। —সত্যিই আমার একটু অন্যায় হয়ে গিয়েছে অপূর্ব।

অপূর্ব—কিসের অন্যায় ?

শান্তনু—দু'দিনের জায়গায় সাতদিন করে দিলাম। তোমাদের বেশ ভুগতে হয়েছে বুঝতে পারছি।

অপূর্ব—কেন ? ভুগবো কেন ?

শান্তনু—তোমাকে বিনা চিনিতে চা খেতে হলো, এর চেয়ে দুর্ভোগ আর কি হতে পারে ?

অপূর্ব—আমার তো একটুও দুর্ভোগ বলে মনে হয় নি। বরং···।

শান্তনু—কি ?

অপূর্ব—বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের মত মনে হয়েছে। রোজই তো মিষ্টি চা খাওয়া হয়, একদিন না হয় সে এক-ঘেয়েমির একটু ব্যতিক্রম হলো।

শান্তনু—তা, তোমার কাছে অ্যাডভেঞ্চার মনে হতে পারে ; কিন্তু উনি তো তা মনে করতে পারবেন না। ওঁর কাছে এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হয়েছে।

এরই মধ্যে জবা গাছে জল ঢেলেছে শান্তনু। বারান্দাটাকেও পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শান্তনু তবুও যেন কাজ খুঁজছে। অপূর্ব বলে—ওসব এখন রেখে দাও শান্তনু। এসো, একটু গল্পসল্প করি।

শান্তনু বলে—না হে বন্ধু, এখনই একবার বের হতে হবে।

অপূর্ব—কেন?

শান্তনুর চোখ দুটো হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। —স্টেশনের মাষ্টার মশাই অনায়াসে একটা লোক পাঠিয়ে সীতাপাহাড়ের গির্জার পাদরী সাহেবের কাছ থেকে আইডিন আনিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু সেটুকুও করতে পারলেন না। যাই হোক্, আমি এখনই সীতা-পাহাড় যাব।

কথা বলতে বলতেই উঁকি দিয়ে ঘরের ভিতরের দিকে একবার তাকায় শান্তনু, যেখানে খাটের উপর ঘুমিয়ে পড়ে আছে ক্যাপ্টেন, আর শমিতা গম্ভীর হয়ে চেয়ারের উপর বসে আছে।

আর কোন কথা না বলে হয়তো চলেই যেতো শান্তনু, কিন্তু হঠাৎ, যেন ঘরের ভিতরেরই একটা রুষ্ট প্রতিবাদের শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে আর বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তনু।

কথা বলছে শমিতা। বেশ গম্ভীর, বিরক্ত ও রুষ্ট একটা আপত্তির কণ্ঠস্বর। —দরকার নেই।

অপূর্ব চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে। —কি দরকার নেই?

শান্তনু হাসে—তুমি আবার কথা বাড়িও না অপূর্ব। কি দরকার আছে আর কি দরকার নেই, সেটা আমি খুব জানি।

শমিতা—খুব যে জানেন, তার প্রমাণও দিয়েছেন।

অপূর্ব ভ্রূভঙ্গী করে। —তুমি মিছিমিছি এত রাগ করে কথা বলছো কেন শমিতা?

শান্তনু অপূর্বকে বাধা দিয়ে বলে। —তুমি সত্যিই মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছো অপূর্ব। উনি যদি রাগ করে থাকেন, তবে নিশ্চয় মিছিমিছি রাগ করেন নি। আমারই ভুল হয়েছে।

অপূর্ব - তোমার আবার কিসের ভুল?

শান্তনু—আমি গাঁয়ে যাবার আগে হিসেব করে দেখেছিলাম, সাত

দিনের মত চিনি আর কয়লা আছে। বুঝতেই পারিনি যে হিসেবেই ভুল হয়েছে।

অপূর্ব বিরক্ত হয়ে বলে—চিনি আর কয়লার হিসেব কখনও নির্ভুল হয় না। কারও সাধ্যি নেই যে, এসব জিনিস নিয়ে সব সময় মাথা ঠিক রেখে হিসেব টিসেব করতে পারে।

আর দেরি করে না শান্তনু। শান্তনুই বলে—আমি এখনি গিয়ে কয়লা আর চিনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আইডিনটা আনতে অবশ্য বিকেল হয়ে যাবে।

চলে যায় শান্তনু। বাইরের ফটকের কাছে শান্তনুর সাইকেলের ঘন্টির শব্দটাও একবার ঝঙ্কার দিয়ে বেজে ওঠে। ফটকের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে শমিতা, শান্তনু চলে গেল।

সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে অপূর্বকে যেন আরও বিচিত্র এক রুষ্টস্বরের জ্বালা নিয়ে প্রশ্ন করে শমিতা। —বেশ খুশি হলে তো?

—কি বললে?

—বন্ধুর সামনে আমাকে অপমান করে খুশি হয়েছ তো?

—অপমান?

—তা'ছাড়া আর কি?

—আমি কাউকে অপমান করি নি। আমার কাছে বাজে কথা বলবে না।

—বাজে কথা নয়। খুব সত্যি কথা বলছি। তুমি আমাকে যতখুশি অপমান করতে পার; করো। আমি একটি কথাও বলবো না। কিন্তু তোমার বন্ধুর সামনে আমাকে অপমান করবার তোমারও কোন অধিকার নেই।

চলে যাচ্ছিল শমিতা। কিন্তু অপূর্ব বাধা দিয়ে বলে—তাহলে আমারও একটা কথা শুনে রাখ।

—কি ?

—আমার সামনে আমার বন্ধুকেও অপমান করবার কোন অধিকার তোমার নেই।

—শুনলাম।

মহুয়ামিলানের ফরেস্ট রেঞ্জারের এই শান্ত কোয়ার্টারের প্রাণটা বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। অদ্ভুত ও অর্থহীন কতগুলি অধিকারের প্রশ্ন হঠাৎ মুখর হয়ে যেন একটা জটিল অদৃষ্টের সঙ্গে ঝগড়া করেছে আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন জেগে উঠে চেঁচামিচি করলেও মনে হয়, ছেলেটা যেন এই ঘরের ভিতরে একটা একলা প্রাণের মত চেঁচামিচি করছে, যেন ঘরে আর কেউ নেই।

আর, অফিসের কাগজপত্রের ফাইল নিয়ে অপূর্ব ব্যস্তভাবে লেখা-জোখা করলেও মনে হয়, সেটা যেন একটা ব্যস্ততার অভিনয় মাত্র। রান্না করে শমিতা, হাতাখুন্তির শব্দও বাজে; কিন্তু শমিতার জীবনের এই ব্যস্ততাও যেন একটা উদাস ব্যস্ততা। দু'জনের কেউ যেন বুঝতেই পারছে না, কেন, কিসের জন্য আর কার জন্যে কাজ করছে।

দুপুরটা পর্যন্ত হরিয়ার মা ছিল বলেই শমিতার গম্ভীরতা একটা অসুবিধের উপদ্রব থেকে রেহাই পেয়েছে। শমিতার কোন কথা বলবার দরকার হয় নি। রান্না হয়ে যাবার পর হরিয়ার মা অপূর্বকে ডাক দিয়েছে। অপূর্বর গম্ভীরতাও বেঁচে গিয়েছে। কোন কথা বলতে হয়নি, প্রশ্নও করতে হয়নি; হরিয়ার মা'র ডাক শুনেই রান্না-ঘরের বারান্দায় এসে চুপচাপ ভাত খেয়ে চলে গিয়েছে অপূর্ব।

বিকেল বেলাটা যখন ফুরিয়ে আসছে, শালবনের মাথার উপর দিয়ে বকের ঝাঁক উড়ে চলেছে, তখনও মহুয়ামিলানের এই সংসারের

স্বামী-স্ত্রীর সান্নিধ্যটা যেন এই বিচিত্র গম্ভীরতার তাড়নায় দুইভাগে ভাগ হয়ে আর ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকে। বাইরের ঘরে অপূর্ব আর ভিতরের ঘরে শমিতা। অপূর্ব একমনে বই পড়ে ; শমিতা একমনে লেস বোনে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তা'ও বোধহয় দু'জনেই ভুলে গিয়েছিল, নইলে ঘরে আলো জ্বালবার জন্য কারও না কারও মনে কিংবা আচরণে একটা ব্যস্ততা বা আগ্রহেব সাড়া দেখা দিত নিশ্চয়।

কিন্তু হঠাৎ একটি ব্যস্ততার কণ্ঠস্বর বাইরের বারান্দা থেকেই প্রশ্ন করতে করতে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। —একি কাণ্ড? ঘরে মানুষ নেই নাকি? এখনও আলো জ্বলেনি কেন?

অপূর্বকে একটা ঠেলা দিয়ে প্রশ্ন করে শান্তনু। —অন্ধকারের মধ্যে ভুতের মত শুয়ে আছ কেন?

নিজেরই হাতে আলো জ্বেলে নিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে শান্তনু—একি? আপনি ওভাবে চুপ করে বসে কি ভাবছেন?

আইডিনের শিশিটা টেবিলের উপর রেখে আর রুমালে বাঁধা চিনির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে স্টোভের দিকে এগিয়ে যেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে শান্তনু। —ওঠ অপূর্ব, তোমার জন্য এখন ডবল চিনি দিয়ে চা তৈরী করবো।

চা তৈরী করবার পর, যেন একটু বিস্মিত হয়ে আর একটু সন্দিগ্ধ হয়ে শমিতার দিকে তাকায় শান্তনু। তারপরেই বিড় বিড় করে। —আজ আপনাদের রকমসকম কেমন যেন মনে হচ্ছে।

চেঁচিয়ে অপূর্বকে ডাক দেয় শান্তনু। —তোমরা কি এতক্ষণ ধরে নীরবে একটা অভিমানের ডুয়েল লড়ছিলে অপূর্ব? ব্যাপার কি? দু'জনে এত গম্ভীর কেন?

তিন কাপ চা হাতে নিয়ে অপূর্বর ঘরে ঢুকে আরও জোরে চিৎকার করে শমিতাকে ডাক দেয় শান্তনু। —আপনি এখানে এসে বসুন।

শিগ্‌গির আসুন। খেলাড়ির কাছে আজ ট্রেণ ডিরেল হয়েছে, ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে, আসুন গল্প শুনে যান।

শমিতা আসে। অপূর্বও বিছানার উপর উঠে বসে। শান্তনু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়েই একবার থেমে নিয়ে হেসে ফেলে। —ট্রেণ দুর্ঘটনার গল্প বলবার আগে আমি কিন্তু একটা সর্ত করে নিতে চাই।

অপূর্ব একটুও উৎসাহিত না হয়ে আর কোন কথা না বলে শুধু জিজ্ঞাসুভাবে তাকায়।

শান্তনু বলে—সর্ত এই যে, তোমাদের দু'জনের এরকম মুখভার ব্রত চলবে না। অন্তত আমার সামনে চলবে না। আমি যতক্ষণ সামনে আছি, ততক্ষণ তোমাদের দুজনের কারও এরকম গম্ভীর হয়ে থাকবার কোন অধিকারই নেই।

হেসে ফেলে অপূর্ব ; শমিতাও হাসে।

শান্তনু একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলে—তোমরা আমার কথাটাকে ঠাট্টা করবার জন্যে হাসছো মনে হচ্ছে।

অপূর্ব বলে—না, তা নয়। ঐ অধিকার কথাটার কাণ্ড দেখে হাসছি।

শান্তনু—তার মানে ?

অপূর্ব—যেমন আমি, তেমনই আমার উনি, আর শেষ পর্যন্ত তুমিও ; সবাই আজ দেখাছি অধিকারের কথা তুলছো।

শান্তনু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। —তাই বল। তোমাদের দু'জনের গম্ভীরতা ঘটিয়েছে বোধ হয় এই অধিকার।

অপূর্ব—তাই তো দেখলাম।

শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তনু এইবার বেশ শান্ত স্বরে, যেন একটা আবেদনের সুরে আস্তে আস্তে বলে—সত্যি, অধিকার কথাটাই একটা ভয়ানক অপয়া কথা। ও কথা তুলতেই নেই। বরং যতদূর সাধ্যি অধিকার ছেড়ে দিয়ে··· ।

শমিতার চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে শান্তনু।—আপনার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ মাইল পথ সাইকেলে পার হতে হয়েছে; আর সারাটা পথ বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে। দুপুর বেলা সাইকেল নিয়ে জঙ্গল দেখতে বের হয়েছিল অপূর্ব; ফিরে এল যখন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার আর মেঘলা আকাশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

অপূর্বর সাইকেলের কেরিয়ারে অদ্ভুত একটা বস্তু দড়ি দিয়ে বাঁধা। দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয় শমিতা, আর চোখ দুটোও যেন চমকে ওঠে।

সত্যিই যে অভাবিত আর অকল্পনীয় ব্যাপার। ঘোর বর্ষার এই সন্ধ্যার অন্ধকার আর বৃষ্টি ঠেলে ঘরে ফেরবার সময় ঘরেরই কোন দরকারের বস্তু সঙ্গে নিয়ে আসবে অপূর্ব; এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে?

চবচবে ভেজা শরীর নিয়ে বারান্দায় উঠেই ব্যস্তভাবে আর বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে কথা বলে অপূর্ব। —একটা গল্প শোন শমিতা; অদ্ভুত গল্প।

শমিতা বলে—হাঁড়িটা কিসের হাঁড়ি?

অপূর্ব—লাড্ডুর হাঁড়ি। ক্ষীরের লাড্ডু। কমলনারায়ণের প্রসাদ।

শমিতা—তার মানে?

অপূর্ব—সেই কথাই তো বলছি। সে একটা অদ্ভুত মজার গল্প। নিজের চোখে দেখে এলাম।

বোধহয় সেই চবচবে ভেজা মূর্তি নিয়েই গল্প বলতে শুরু করতো অপূর্ব। শমিতা বাধা দেয় বলেই, সাজ বদল করে; গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে তারপর গল্প শুরু করে।

—আমি আগে জানতাম না, কারও কাছ থেকে কখনও শুনিওনি যে, রাজপুরার জঙ্গলের ভিতরে এরকম একটা মন্দির আছে। খুব প্রাচীন মন্দির। দেবতার নাম কমলনারায়ণ। মন্দিরের সামনেই একটা পুরণো পুকুর ; নাম রাণীডোবা।

শমিতা—কি নাম ?

অপূর্ব—রাণীডোবা। অনেকদিন আগে কোন্ এক রাজার রাণী ঐ মন্দিরের কমলনারায়ণের পূজো করতেন। পূজোর একটা নিয়ম ছিল, অন্য কোন ফুল দিয়ে নয়, শুধু কমল দিয়ে ঐ নারায়ণের পূজো করতে হবে। রাণী সেইজন্যে মন্দিরের সামনেই একটা পুকুর কাটিয়ে নিয়ে তাতে পদ্ম ফলিয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দিন কমলনারায়ণের পূজো করবার সুযোগ পাননি সেই রাণী। কোথা থেকে এক শত্রু-রাজা এসে রাজপুরার উপর হামলা করেছিল। তাঁর মতলব ছিল, শুধু ঐ সুন্দরী রাণীকে নিয়ে সে চলে যাবে ; রাজপুরার আর কোন জিনিস সে স্পর্শ করবে না। কিন্তু···।

শমিতা হাসে—মতলব সফল হয়নি বোধ হয়।

অপূর্ব—না, সেই রাণী ঐ পুকুরের জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন। সেই জন্যেই ঐ পুকুরটার নাম হয়েছে রাণীডোবা।

শমিতা—এ গল্প কোথায় শুনলে ?

অপূর্ব—মন্দিরের পূজারী এক বুড়ো মিশিরজী বললেন। আশ্চর্যের কথা, আজও সেই মন্দিরের কমলনারায়ণকে প্রতি সপ্তাহে কমল দিয়ে পূজো করা হয়। তবে···।

শমিতা—কি ?

অপূর্ব—তবে জলকমল দিয়ে নয়, আজকাল স্থলকমল দিয়ে পূজো করা হয়।

শমিতা—কেন ?

অপূর্ব—পূজারী মিশিরজী বললেন, জলকমলের উপর ভরসা রাখা

সম্ভব নয়। রাণীডোবাটা গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে যায়। বর্ষাকালে পাঁক থৈ-থৈ করে। এ রাণীডোবাতে কমল ফুটবে কি ফুটবে না, কোন ঠিক নেই। যদিও বা ফোটে, তবে তুলে আনা সম্ভব হয় না। জংলা জলজ লতায় ঠাসা সে পুকুরে সাঁতার দেওয়া সম্ভব হয় না। দড়ি বা লগি দিয়ে টেনে আনতে গেলে কমল ছিঁড়ে যায়। তাই পূজোর জন্যে জলকমলের উপর আর নির্ভর করা হয় না। এখন স্থলকমলেই পূজো হয়। দেখলাম, মন্দিরের চারদিক জুড়ে মস্তবড় একটা বাগান; শুধু স্থলকমলের গাছ। মিশিরজী বললেন, এই বাগানে বার মাস স্থলকমল পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম হলে ভয় নেই, বর্ষা হলেও ভয় নেই। যখন দরকার তখনই পাওয়া যায়; কমলনারায়ণের পূজো দিতে কোন অসুবিধায় পড়তেও হয় না।

হাঁড়িটাকে সাইকেলের কেরিয়ার থেকে তুলে নিয়ে এসে ঘরেরই এককোণে রেখে দিয়েছিল অপূর্ব। এইবার হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে অপূর্ব উৎফুল্লভাবে বলে—আধ হাঁড়িরও বেশি হবে, ইয়া বড় বড় ক্ষীরের লাড্ডুর প্রসাদ দিয়েছেন মিশিরজী।

হাঁড়িটার দিকে এগিয়ে যায় শমিতা। হাঁড়িটার ভিতরের বস্তুটাকে যেন চিনতে চেষ্টা করে শমিতা; কিন্তু চিনতে পারে না। রুক্ষ দৃষ্টি তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর হেসে ফেলে শমিতা।

অপূর্ব বলে—কি হলো?

শমিতা—হাঁড়ির ভিতরে কি?

অপূর্ব—কেন? ক্ষীরের লাড্ডু।

শমিতা—না, ক্ষীরের লাড্ডু নয়; ক্ষীরের কাদা।

অপূর্ব—তার মানে?

শমিতা—তার মানে, হাঁড়ির মুখটা খোলা ছিল; বৃষ্টির জলে সব গলে গিয়েছে

অপূর্ব আক্ষেপ করে। —সত্যি, বড় বিশ্রী ভুল হয়েছে। অন্তত এক টুকরো কাগজ দিয়ে যদি হাঁড়ির মুখটা ঢাকা দিয়ে…।

শমিতা—না, কাগজ দিয়ে নয়।

অপূর্ব—তবে ?

শমিতা—পাতা দিয়ে।

অপূর্ব—কেন ?

শমিতা—কাগজও বৃষ্টিতে ভিজে যায়, গলে যায়।

অপূর্ব হাসে—তাই বল। আমি অবশ্য অতটা ভেবে দেখি নি। যাই হোক্, এই গল্পটা তোমার কেমন লাগলো ?

শমিতা—কোন্ গল্প ?

অপূর্ব—এই যে এখনই বললাম ; জলকমলের গল্প।

শমিতা মুখ টিপে হাসে—ভালই লাগলো।

অপূর্ব—হাসছো কেন ?

শমিতা—জলকমলের ভরসায় থাকলে এইরকমই ব্যাপার হয়।

অপূর্ব—কি ব্যাপার হয় ?

শমিতা—ক্ষীরের লাড্ডু ক্ষীরের কাদা হয়ে যায়।

অপূর্ব চোখ বড় করে তাকায়। —তুমি আমাকেই জলকমল বলে নিন্দে করছো বলে মনে হচ্ছে।

অপূর্বর কথার কোন জবাব না দিয়ে, শুধু এক ঝলক মিষ্টি হাসি উথলে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে শমিতা—এইবার পাঁচ মিনিট নীরব হয়ে বসে থাক তো। চা নিয়ে আসছি।

রামগড়ের চিঠি এসেছে। শমিতার বাবা লিখেছেন ; আমি খুবই অসুস্থ, তোমার মা ততোধিক। আমি তবু বাতের ব্যথা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারি ; কিন্তু তোমার মা হার্টের কষ্টে একেবারে শয্যাগত। শুয়ে থাকতেও কষ্ট ; তবু সেটা সহ্য করা যায়…কিন্তু

উঠলে, বসলে বা হাটাহাঁটি করলে কষ্টটা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে; স
করাই সম্ভব হয় না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে হয়।

...আমাদের অদৃষ্টের কথাই ভাবছি। নাতিটা কতবড় হ
উঠেছে; আর এমন কী দূরেই বা আছে; ট্রেণে গেলে রামগড় থে
মহুয়ামিলান তো একবেলার পথ। রাঁচি হয়ে মোটরবাসে গে
বড়জোর আরও ঘণ্টা দুই সময় লাগবে। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে এখা
থেকে নড়তেই পারা গেল না। তোমার মা'রও ঐ একই অবস্থা
যখন-তখন নাতির কথা বলবে আর কাঁদবে; আর অদৃষ্টকে ধিক্কা
দেবে।

...এই অবস্থায়...তার মানে আমি যখন নিতান্ত অশক্ত, তখ
তুমিই একটা ব্যবস্থা কর শমি। তুমি একবার এস। অপূর্ব যেন অন্ত
সাতটা দিনের ছুটি নেয়। সাধ্যি থাকলে আমি নিজেই গিয়ে
তোমাকে নিয়ে আসতাম; কিন্তু সাধ্যি যখন নেই, তখন তোমাকেই
একটু সচেষ্ট হতে হবে। অপূর্ব যদি ছুটি না পায়, তবে তুমি একাই
আমাদের দাতুটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে এস। আমি বরকাকানা
লাহিড়ীকে আগেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে রাখবো; সে তোমাকে সাহায্য
করবে, ট্রেণ বদলি করবার সময় কোন অসুবিধেয় পড়তে হবে না।
রওনা হবার দিনটা আগেই জানিয়ে দিও; আমি লাহিড়ীকে লিখে
দেব, যেন এক সের দুধ জোগাড় করে রাখে। বরকাকানায় ট্রেণ থেকে
নেমেই সবার আগে দাতুকে পেট ভরে দুধ খাইয়ে দিও।

রামগড় থেকে এই চিঠিটা এসেছে বলেই একটা সমস্যা দেখা
দিয়েছে। শমিতাকে বেশ একটু দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছে।

একবার রামগড়ে না গেলে নয়। না যাওয়া খুবই অন্যায় হবে।
অন্যায়টা তো অনেক দিন ধরেই হয়ে আসছে। শমিতার অজানা
নয় যে, বাবার পক্ষে এখন বাড়ির বাইরে বের হওয়া নিতান্ত
অসম্ভব।

বাবা এসে শমিতাকে রামগড়ে নিয়ে যাক্, এমন কেন দাবি শমিতার চিন্তার ভিতরেও নেই। তা ছাড়া, মা'র কথা মনে পড়লে আরও কষ্ট হয়। ক্যাপটেনকে দেখবার জন্য মা'র মন কত ব্যাকুল হয়ে আছে, সেটা এর আগে অনেক চিঠিতে জানতে পেরেছে শমিতা। এর মধ্যে একবার রামগড় ঘুরে আশা খুবই উচিত ছিল। মা'র ইচ্ছে ছিল, ক্যাপটেনের অন্নপ্রাশনের ব্যাপারটা রামগড়ের বাড়িতেই যেন হয়। কিন্তু মা'র সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

খুব ঘটা করে না হোক্, বেশ হৈ-হৈ করে ক্যাপটেনের অন্নপ্রাশনের উৎসবটা এই মহুয়ামিলানেই যেদিন হয়ে গেল, সেদিন শমিতা খুশি হয়ে রামগড়ের বাড়িতে একটা চিঠিও লিখেছিল। ভুলে যায়নি শমিতা, সে চিঠিতে কী লিখেছিল শমিতা।—তুমি জেনে সুখী হবে মা, কোন নিয়মের ত্রুটি হয়নি। রাঁচি থেকে পুরোহিত এসে সব কাজ করেছেন। তোমাদের জামাইয়ের এক বন্ধু ভদ্রলোক খুব সাহায্য করেছেন। এই ভদ্রলোক ব্যবস্থা করে বৈদ্যনাথ আর কাশী বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আনিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রসাদ আর গোপালভোগ চালের পায়েস দিয়ে তোমাদের নাতির মুখে-ভাত হয়েছে। এখানকার তিনজন ভদ্রলোক আর ওর অফিসের যত লোকজন পেট ভরে পোলাও, তিনটে তরকারী, চাটনি আর রাবড়ি খেয়েছে। গাঁ থেকে একদল উরাওঁ নাচিয়ে এসে ঢোলক বাজিয়ে নেচেছে আর গেয়েছে। আমোদ ভালই হয়েছে। তোমরা থাকলে আরও ভাল হতো।

শমিতার বাবার ইচ্ছা ছিল, এবং তিনি এক চিঠিতে লিখেও ছিলেন যে, যাই হোক, অন্নপ্রাশনটা ভালয় ভালয় ওখানে হয়ে গেল, ভালই হলো; কিন্তু দাদুর জন্মদিনের প্রথম বাৎসরিকী আনন্দটা রামগড়েই হবে, শমিতা। আগেই জানিয়ে রাখলাম।

কিন্তু ক্যাপটেনের জন্মদিনের উৎসবটা এই মহুয়ামিলানের মায়া

ঠেলে দিয়ে রামগড়ে চলে যেতে পারেনি। আজও মনে পড়ে শমিতার, সেদিন চিঠিতে কী কথা লিখে রামগড়ের মনটাকে কী সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল : দুঃখ করো না মা ; ওর ছুটি একেবারে অসম্ভব বলেই রামগড়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। তোমাদের নাতির জন্মদিন অবশ্য ভালভাবেই হয়েছে। তোমাদের জামাইয়ের বন্ধু সেই ভদ্রলোক তোমাদের নাতির জন্য নেতারহাট ডাকবাংলা থেকে বার রকমের ফুলের একটি চমৎকার তোড়া এনেছিলেন। বারটা ফুল অর্থাৎ ফুলের মত সুন্দর যে বারটা মাস তোমাদের নাতির বয়সকে এক বছরে পূর্ণ করেছে। ক্যাপটেনের একটা ফটোও তোলা হয়েছে। এই সঙ্গে ফটো পাঠালাম।

রামগড়ের ব্যাকুল মনকে এই ফটো পাঠিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হলেও, রামগড়ের মন যে সান্ত্বনা মানেনি, সেটা এই চিঠিতেই বোঝা যায়। বাবা আর মা দু'জনেই, বোধহয় তাঁদের শরীরের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে, নাতিকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। ঠিক কথা, অন্তত এসময়ে এবার রামগড়ে না গেলে ; বাবা আর মা'র উপর ভয়ানক নিষ্ঠুরতা করা হয়।

চিঠিটা হাতে নিয়ে আর অপূর্বর কাছে এসে দাঁড়িয়ে শমিতা উদ্বিগ্নভাবে বিড়বিড় করে, সত্যি কথা, এসময়ে বাবা আর মাকে একবার না দেখে আসতে পারলে শান্তি পাব না। তিন বছরের মধ্যে এখান থেকে এক পা নড়লাম না ; এটাও তো অদ্ভুত। লোকেই বা কি মনে করবে ?

অপূর্ব—লোকে ?

শমিতা—বলছি, বাবা আর মা মুখে কিছু না বললেও নিশ্চয় মনে করতে পারেন তো ···।

—কি মনে করতে পারেন ?

—মনে করতে পারেন যে, ইচ্ছে থাকলে আমি যেতে পারতাম।

চাড় নেই, তাই যাইনি। বাপ-মা'কে দেখতে এভাবে ভুলে যাওয়া…
কোন মেয়ে এমন কাণ্ড করে না।

—কিন্তু আমি কি কখনও তোমাকে বলেছি যে, তুমি বাপ-মাকে ভুলে যাও, রামগড়ে কখনও যেও না!

—আমি কি তোমাকে দোষ দিচ্ছি? দোষ আমারই। চেষ্টা করলে কি এই তিন বছরের মধ্যে অন্তত একবার রামগড়ে যেতে পারতাম না?

—যাক্, বাঁচালে। অনেকদিন পরে এই প্রথম দেখলাম যে, তুমি আমার দোষ দেখতে পেলে না, তোমার কষ্টের কারণ আমি নই।

শমিতা হাসে।—ঠাট্টা করছো, কর। কিন্তু ভেবে দেখ, আমার এখন একবার রামগড়ে যাওয়া উচিত কি না!

অপূর্ব—খুব উচিত।

শমিতা—তাহ'লে ব্যবস্থা কর।

—তার মানে?

—অন্তত সাতদিনের ছুটি নাও।

—অসম্ভব।

—কেন?

—জঙ্গল অক্‌শন শুরু হবে আর কদিন পরেই; এসময়ে যমে এসে টানলেও ডি এফ ও আমাকে ছুটি দেবে না।

ঘরের ভিতরে ব্যস্তভাবে ঢোকে শান্তনু। —তালের গুড়ে যদি আপনাদের রুচি থাকে, তবে বলুন।

অপূর্ব—এদেশেও তাল গুড় হয় নাকি?

শান্তনু—না, এদেশে নয়। থ্রি ডাউন গুডসের গার্ড পাকড়াশির শালা টাকী থেকে এসেছে; সঙ্গে তাল পাটালি নিয়ে এসেছে। দেড় টাকা সের। যদি পছন্দ করেন তো বলুন; এখনই খবর পাঠিয়ে দিই।

শমিতা হাসে—আপনার কি ই'চ্ছে, সেটা বলুন।

শান্তনু—আমি বলি, অন্তত আধ সের তালপাটালি রাখা হোক্।

শমিতা—রাখুন তাহলে।

শান্তনু—তাহলে বার আনা পয়সা দিন।

পয়সা নেবার জন্য দেয়ালের তাক থেকে একটা কৌটা হাতে তুলে নিয়ে কি-যেন বলতে চেষ্টা করে শমিতা; কিন্তু বলতে পারে না; কারণ অপূর্ব হঠাৎ শান্তনুর দিকে তাকিয়ে একটা কথা বলে শমিতাকে চমকে দিয়েছে।—তোমার তো কোন উপরওয়ালার হুকুমের বালাই নেই শান্তনু; তুমি তো অনায়াসে সাতটা দিন সময় করে নিতে পার।

শান্তনু—কেন? কিসের জন্য?

অপূর্ব—রামগড়ের বাড়ি বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নাতিকে দেখতে চায়। তা ছাড়া, নাতির দাদু আর দিদিমা, দু'জনেই খুব অসুস্থ। নাতির দিদিমার মেয়েও বলছেন যে, এসময়ে অন্তত সাতটা দিনের মত রামগড়ে বাবা-মা'র কাছে থাকতে পারলে···।

শমিতার দিকে তাকিয়ে শান্তনু কথা বলে—আপনি রামগড় যেতে চান?

শমিতা—হ্যাঁ।

শান্তনু—তবে চলে যান। অসুবিধে কোথায়?

শমিতা—নিয়ে যাবে কে?

শান্তনু—অপূর্ব নিয়ে যাবে।

শমিতা—উনি তো বলছেন, অসম্ভব!

অপূর্ব চেঁচিয়ে ওঠে। —নিতান্ত অসম্ভব, শান্তনু। আমাকে এসময়ে কোন ঝঞ্ঝাটে না জড়িয়ে তোমরা যদি একটা সুব্যবস্থা করে ফেলতে পার, তবে খুবই ভাল হয়।

শান্তনু—বুঝলাম না, তুমি কি বলতে চাইছো?

অপূর্ব—বলছি, তুমি শমিতাকে রামগড়ে পৌঁছে দিয়ে এস।

—আমি? আমি কেন? প্রশ্ন করতে গিয়ে শান্তনুর গলার স্বর যেন ধক্ করে জ্বলে ওঠে; ছোট্ট অথচ বেশ কঠোর একটা আপত্তির ভ্রূকুটিও শান্তনুর চোখ দুটোকেও যেন হঠাৎ কাঁপিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ে না অপূর্বর, কোন দিন অপূর্বর সঙ্গে রুক্ষ স্বরে কথা বলেছে শান্তনু। শমিতারও মনে পড়ে না, শান্তনুবাবুর চোখে কোন দিন এরকম ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছে।

অপূর্ব একটু বিব্রতভাবে বলে—কেন শান্তনু, কী এমন অন্যায় কথা বললাম যে···।

শান্তনু—না; এটা কোন কথাই নয়।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, শমিতা কোন কথা বলছে না। শমিতাও যেন মনে করছে যে, অপূর্ব খুবই সরল আর শোভন একটা অনুরোধের কথা বলেছে; কিন্তু শান্তনু বাবু সে-অনুরোধের কথাটাকে বুঝতে না পেরে, কিংবা নিতান্ত ভুল বুঝে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

কি যেন ভেবে, আর কি যেন সন্দেহ করে শমিতার উদ্বিগ্ন মুখটার দিকে তাকিয়ে, আর খুবই মৃদু স্বরে কথা বলে শান্তনু—এর মানে এ নয় যে, আপনার রামগড় যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি যাবেন, অপূর্বই নিয়ে যাবে।

অপূর্ব—আমি ছুটি পাব না।

শান্তনু—খুব পাবে।

অপূর্ব—না।

শান্তনু—আমি পাইয়ে দেব।

অপূর্ব—তুমি পাইয়ে দেবে কিরকম?

শান্তনু—তোমাদের ডি এফ ও মনোহরলালের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। আমি লাতেহারে গিয়ে মনোহরলালকে বলবো;

তুমি ছুটি চেয়ে দরখাস্ত কর। আমি একদিনের মধ্যেই ছুটি মঞ্জুর করিয়ে আনবো।

শমিতা একটা হাঁপ ছেড়ে হেসে ফেলে—বাস্, এই তো সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

অপূর্ব কিন্তু অপ্রসন্নভাবে বিড় বিড় করে। —হ্যাঁ, সাতটা দিন আমাকে অনর্থক হয়রান করবার খুব চমৎকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

অপূর্বর সাতদিনের ছুটির মাত্র ছুটি দিন পার হয়েছে। রেঞ্জার অপূর্ব, রেঞ্জারের বউ শমিতা, আর রেঞ্জারের পুচকে ছেলেটা যে রামগড়ে গিয়েছে, একথা শুনেছেন স্টেশনের মাষ্টার মশাই-এর স্ত্রী আর চিন্তামণি বাবুর স্ত্রী।

গল্প করতে করতে দুজনে হেসে ফেলেন। —পাথর বাবুটার প্রাণ যে আইঢাই করছে দিদি।

—নতুন খবর কিছু শুনেছেন বোধ হয়?

—এমন কিছু নতুন খবর নয়। তবে এবার বেশ বোঝা গেল, সত্যিই ব্যাপারটা গোলমেলে।

—কেন, পাথরবাবুও কি রামগড় পানে দৌড় দিয়েছে?

—না।

—তবে?

—শূন্য মন্দিরে দীপ জ্বালছে। ঘরে কেউ নেই; তবু দু'বেলা জঙ্গলবাবুর কোয়ার্টারে এসে ঘুরঘুর করছে। সন্ধ্যা হলেই আলো জ্বালছে। হরিয়ার মা'কে বকাবকি করে ঘরের বারান্দা তিনবার করে ঝাড়ু দেওয়াচ্ছে। আর....ইস্...আরও যা কাণ্ড করছে দিদি।

—কি কাণ্ড দিদি?

—হরিয়ার মা বললে, আজ সারাটা দুপুর কুয়োতলায় বসে

শমিতার বাচ্চাটার যত পুরনো কাঁথা আর ময়লা জামা-কাপড় সাবান-কাচা করেছে পাথরবাবু।

—কী সর্বনেশে কাণ্ড। তুক্ করলেও তো মানুষ এমন বশ হয় না।

চিন্তামণি বাবুও একদিন ষ্টেশনের মাষ্টার মশাই-এর কাছে কথায় কথায় বলে ফেললেন—সত্যি, বড় অদ্ভুত ব্যাপার মাষ্টার মশাই।

—কি?

—এই আমাদের পাথরবাবু শান্তনু দত্তের কথা বলছি।

—কি করেছেন ভদ্রলোক?

—অপূর্ব বাবু তো সস্ত্রীক আর সপুত্রক রামগড়ে গিয়েছেন। রেঞ্জারের কোয়ার্টার শূন্য। কিন্তু সেই শূন্য কোয়ার্টারের বারান্দার উপর মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে আছেন শান্তনু দত্ত।

—আপনি দেখলেন নাকি?

—স্বচক্ষে দেখলাম।

—আমিও স্বকর্ণে একটা কথা শুনেছি।

—কবে?

—এই যেদিন সস্ত্রীক ট্রেনে উঠলেন জঙ্গল বাবু। শান্তনু বাবু ওদের ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন।

—কিন্তু কথাটা কি শুনলেন?

—অপূর্ব বাবুর স্ত্রী বললেন শান্তনু বাবুকে, আপনার এ সাতটা দিন খুব বিশ্রী লাগবে বোধ হয়?

—অ্যাঁ? মহিলা এরকম কথা বলতে পারলেন?

—পারলেন বই কি! আমি নিকটেই দাঁড়িয়েছিলাম, তাই শুনতে পেলাম।

—শান্তনু দত্ত কি বললেন?

—কিছু বললেন না; শুধু হাসলেন। ট্রেন ছাড়বার সময় আর-

এক কাণ্ড। কামরার জানালা দিয়ে উঁটের মত গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন শান্তনু দত্ত, ক্যাপটেন, ক্যাপটেন!

—তার মানে?

—তার মানে অপূর্ব বাবুর বাচ্চাটা।

—দেখা যাচ্ছে, খাঁটি বাপের চেয়ে পাতানো বাপও কম যায় না।

—কম বলছেন কেন? বলুন বেশি, বেশি।

সাতদিন পরে রামগড় থেকে ফিরে এসে যখন মহুয়ামিলানের ফরেষ্ট রেঞ্জারের এই কোয়ার্টারের ভিতরে দাঁড়ায় শমিতা, তখন শমিতাও বোধ হয় বুঝতে পারে না, কী সুন্দর একটি তৃপ্তির হাসিতে শমিতার সারা মুখটাই সুন্দর হয়ে ঢলঢল করছে। শমিতার সংসারের নীড় ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। এই সাতটা দিনের একটা মুহূর্তও বোধহয় শমিতার এই ঘরের শূন্যতা কোন কষ্ট পায় নি। যেখানে যে জিনিস যেমনটি ছিল, সে জিনিস ঠিক তেমনটি সেখানে আছে। আলনার এলোমেলো চেহারাটা বরং আরও পরিচ্ছন্ন। ক্যাপটেনের ছেঁড়া জামাগুলো পর্যন্ত সাবান-কাচা হয়ে আর ভাঁজ হয়ে একটা তাকের উপর সাজানো রয়েছে। জবা গাছে তিনটে লাল টকটকে ফুল দুলছে।

অপূর্ব বলে—সত্যি কথা বলতে হলে বলতে হয়, এ সাতটা দিন আমার একটুও ভাল কাটেনি হে শান্তনু।

শমিতাও বলে—আমার ভালই কেটেছে। তবে…হ্যাঁ…বারবার মহুয়ামিলানের কথা মনে পড়েছে। সত্যিই, জায়গা হিসেবে মহুয়া-মিলানের তুলনায় রামগড় কিছুই নয়।

শান্তনু চলে যাবার পর অপূর্ব হঠাৎ যেন একটা দুঃসহ অভিযোগের মত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে! —তোমারই জন্যে রামগড়টা আমার ভাল লাগেনি।

শমিতা—কেন? আমি কি অপরাধ করলাম?

—তুমি যদি অন্তত একটা দিনও আমার সঙ্গে একবার দামোদরের ধারে বেড়িতে আসতে যেতে, তবে না হয় মনে করতে পারতাম যে, রামগড়ে আসা সার্থক হলো। কিন্তু, অদ্ভুত ব্যাপার, তোমার কোন গরজই দেখলাম না। একবার মুখ খুলে বলেছিলাম পর্যন্ত, তবুও তুমি···।

শমিতা হাসে। —মার্জনা চাই।

অপূর্বও হাসে—না, নো মার্জনা। তুমি আমাকে বেশ ঠকাচ্ছো শমিতা।

শমিতা—আর কখনো এ ভুল হবে না।

অনেক দিনের ইচ্ছা, সেই স্বপ্নময় সাধ আর কল্পনার ছবিগুলি যেন অপূর্বর চোখের উপর পিপাসাময় হয়ে ফুটে ওঠে। অপূর্ব বলে—তবে স্পষ্ট করে বল, কান্তি-নির্ঝর দেখতে তোমার সত্যিই ইচ্ছে আছে?

—খুব আছে।

—পাহাড়ী নদীর ধারে পাথরের উপর দুজনে ব'সে, বিকেলের শালবনের ফুরফুরে হাওয়াতে, চুপ করে শুধু ঘুঘুর ডাক শুনতে··· সত্যিই কি তোমার একটুও লোভ হয় না?

—খুব লোভ হয়।

—তাহলে কথা রইল।

—হ্যাঁ।

সত্যি এরকম একটি ফুরফুরে হাওয়ায় ভরা বিকেলবেলা দেখা দিল। দূরের বনে পলাশের মাথাও লাল হয়ে যেন আগুন-খাওয়া নেশায় টকটক করছে। হরিয়ার মা হলুদ ছোপানো নতুন একটা শাড়ি পরেছে। গলাতে তিন ছড়া কুঁচের মালাও জড়িয়েছে। তাই আজ হরিয়ার মা'কে যেন বেশ একটু পছন্দ করেছে ক্যাপটেন।

ক্যাপ্টেনকে কোলে নিয়ে হরিয়ার মা স্টেশনের দিকে বেড়াতে গিয়েছে। ঘরের বাইরে এসে বারান্দার উপর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে শমিতা।

এখন যদি চিন্তামণি বাবু এই পথ দিয়ে যেতেন, তবে শমিতার মুখটা দেখতে পেয়ে নিশ্চয় একটা সন্দেহ করতেন যে, শমিতাও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তকতকে ঝকঝকে আর নিশ্চিন্ত এক সুখের সংসারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের কোন দৃশ্যের দিকে তাকাচ্ছে না শমিতা; নিজেই একটা দৃশ্য হয়ে বাইরের চোখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অপূর্ব হঠাৎ এসে বলে—কি দেখছো শমিতা?

—কিছু না।

—কিছুই বুঝতে পারছো না?

—না।

—বিকেলের এই সুন্দর চেহারাটাও চোখে পড়ছে না?

—অ্যাঁ?

—হাওয়াটা ফুরফুরে নয় কি?

—কি বললে?

—এ-বেলাটা আমার ছুটি। কোন কাজ নেই।

—বেশ তো।

—তবে চল।

—কোথায়?

—এই তো, এখান থেকে বড়জোর একমাইল হবে। ছোট্ট একটা নদী আছে, নাম সোনাঝুমুরিয়া। চমৎকার দেখতে। চল, বেড়িয়ে আসি।

—কিন্তু…

—কিন্তু আবার কি?

—আমার যে কাজ আছে।

—রাখ তোমার কাজ!

—আজ থাক্।

অপূর্ব আর পীড়াপীড়ি করে না।—তবে থাক্। আমিও তবে কাজ নিয়ে বসি।

আস্তে আস্তে হেঁটে অফিস-ঘরের দিকে চলে যায় অপূর্ব।

শমিতাও হয়তো ঘরের ভিতরে চলে যেত; কিন্তু যেতে পারে না। কারণ, চোখে পড়েছে শমিতার, দূরের সড়কের বাঁকের কাছে নিমের ছায়া ভেদ ক'রে একটা সাইকেল ছুটে আসছে। কোন সন্দেহ নেই, শান্তনু বাবু সাইকেল ছুটিয়ে এই দিকে আসছেন।

বারান্দার গায়ে সাইকেলটাকে হেলিয়ে দিয়ে শান্তনু ব্যস্তভাবে সেই কথাই বলে—কই, ক্যাপটেন কোথায়?

শমিতা হাসে—ক্যাপটেন আজ হরিয়ার মা'র সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে।

শান্তনু হাসে—আশ্চর্যের ব্যাপার। ক্যাপটেন দেখছি খুব উদার হয়েছে; হরিয়ার মা'র সঙ্গে বেড়াতে যেতে রাজি হয়ে গেল?

শমিতা—সাধে কি উদার হয়েছে! অন্য একটা কারণও আছে।

শান্তনু—কি?

শমিতা—হরিয়ার মা আজ হলুদ ছোপানো শাড়ি পড়েছে, গলায় কুঁচের মালা জড়িয়েছে।

শান্তনু—তাই বলুন। ক্যাপটেনের চোখ নতুন রং-এর মায়ায় ভুলেছে।···হ্যাঁ, একটা কথা, কাশির সিরাপটা নিয়মমত খাচ্ছে তো অপূর্ব?

শমিতা—হ্যাঁ, ভয়ে ভয়ে খাচ্ছেন।

শান্তনু—ভয়ে? কার ভয়ে?

শমিতা—আমার ভয়ে নয়; আপনারই ভয়ে।

শান্তনু—ভাল কথা। এরকম ভয় থাকা ভাল।...আচ্ছা, আমি এখন একবার ওদিকে ঘুরে আসি।

শমিতা—কোন্ দিকে ?

শান্তনু—স্টেশনের দিকেই যাই। তিনটে ওয়াগন চেয়েছি ; দেখি কোন জবাব এসেছে কিনা ?

শমিতা—আপনার বোধ হয় বেড়াবার শখ-টখ নেই।

শান্তনু—কি বললেন ?

শমিতা—আপনার বন্ধু বললেন, এখান থেকে খুব কাছেই সোনা-ঝুমুরিয়া নামে একটা পাহাড়ী নদী আছে।

শান্তনু—এই তো, এখান থেকে বড় জোর একমাইল হবে।

শমিতা—নদীটা নাকি দেখতে চমৎকার।

শান্তনু—চমৎকার। সাদা আর লালচে, দু'রকম রঙের পাথর যেন পাশাপাশি দুটো চাদরের মত পাতা। তার ওপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নদীটাকে দু'রঙের দুটো স্রোতের ধারা বলে মনে হয়।

শমিতা—চলুন তবে, দেখে আসি।

শান্তনু—চলুন।

দূরের সড়কের ঐ বাঁকের কাছে যেখানে নিমের ছায়া ঘন হয়ে আছে, সেখানে এসে মাঠের উপর নেমে পড়লে, আর, মাত্র দশ মিনিট ধরে হেঁটে এগিয়ে গেলে, খেজুর আর কেঁদের ছোট বনটার পাশেই সোনাঝুমুরিয়াকে দেখতে পাওয়া যায়।

দেখতে পায় শমিতা, চমৎকার সোনাঝুমুরিয়ার জল দু'রকম রঙের পাথরের বুকের উপর দিয়ে কলকল করে গড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যই নদীটা দোরঙা ধারার মত। সাদাতে আর লালেতে মেশামেশি নেই ; কিন্তু মিল আছে।

নদীর কিনারায় শুকনো বালুর উপরে কন্টিকারীর ঝোঁপ ; ছোট

ছোট নীলরঙা ফুলের কাছে ফড়িং উড়ে বেড়ায়। শাড়িটা যেন কণ্টিকারীর গায়ে না লাগে, কাঁটায় ফেঁসে না যায়; তাই আস্তে আস্তে আর সাবধানে পা ফেলে, আর শাড়ি বাঁচিয়ে হাঁটতে থাকে শমিতা।

শান্তনু বলে—আপনি এখানেই দাঁড়িয়ে নদীর জলের রঙের কেরামতি দেখুন; আমি ততক্ষণ খোঁজ করে দেখি···।

শমিতা—এখানে আবার কি খোঁজ করবেন?

শান্তনু—কেঁদ পেকেছে কিনা। এত টিয়ার চেঁচামিচি শুনে মনে হচ্ছে, কেঁদ পেকেছে।

সোনাঝুমুরিয়ার দোরঙা স্রোতের পাশে দাঁড়িয়ে আর স্রোতের একটানা কলরোল অনেকক্ষণ ধরে শুনেও কিন্তু শমিতা আনমনা হয়ে যায় না, উদাসও হয় না। বরং বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করে।

কেঁদবনের ভিতরে শান্তনুর ছুটোপুটির সঙ্গে টিয়ার ঝাঁক উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। শমিতা ডাক দেয়—আপনি কোথায় গেলেন?

—এই, আর দু'মিনিট অপেক্ষা করুন। যাচ্ছি।

পকেট ভর্তি করে পাকা কেঁদ নিয়ে এসে শান্তনু ব্যস্তভাবে বলে—চলুন এবার।

শমিতার চোখের দৃষ্টিটা যেন মেঘে-ঢাকা বিদ্যুতের হতাশ জ্বালার মত করুণ হয়ে চমকে ওঠে। চমৎকার সোনাঝুমুরিয়াকে দু'চোখ ভরে দেখবার আশাটাই যেন মিথ্যে হয়ে গেল।

শমিতা বলে—চলুন। আপনার অনেকটা সময় নষ্ট হলো।

চলতে চলতে জবাব দেয় শান্তনু—না, কি আর এমন সময় নষ্ট হলো।

—তা ছাড়া, আমার কথায় পড়ে এখানে এসে এতটা সময় মিছি-মিছি নষ্ট করা···।

শান্তনু হাসে—আমার কিন্তু মনেও হয়নি যে, আপনার কথায় পড়ে মিছিমিছি সময় নষ্ট করবার জন্য এখানে এসেছি।

শমিতা—তবে বলুন না কেন, এরকম মিছিমিছি সময় নষ্ট করাই আপনার অভ্যেস।

শান্তনু—তা বলতে পারেন।

শমিতা—তা হলে স্বীকার করুন, শুধু অভ্যেসের জন্যেই এসেছেন, আমার কথায় পড়ে আসেন নি।

শান্তনু—তাই বা বলবো কেন?

শমিতা—না বললে আমি বিশ্বাস করবো কেন? আমার ধারণা

শান্তনু—কি?

শমিতা—যে কেউ অনুরোধ করলে আপনি আসতেন।

শান্তনু হাসে—যে কেউ এসে আমাকে এমন অনুরোধ করবেই বা কেন? আমি কি দুনিয়ার সবারই অনুরোধ খাটবার জন্য চুক্তি করেছি?

শমিতা—দেখে তো তাই মনে হয়।

শান্তনু—কি দেখলেন যে এরকম মনে করছেন?

শমিতা—দেখছি। সবই দেখছি।

শান্তনু—কিছুই দেখছেন না। মিছিমিছি অভিযোগ করছেন।

শমিতা হাসে—যদি এখনি সোজা একটা প্রশ্ন করে ফেলি, তবে কিন্তু বিপদে পড়বেন।

শান্তনু—বিপদে পড়তে ভয় পাই না। বলুন, কি এমন ভয়াবহ প্রশ্ন আপনি করতে চান?

শমিতা—আপনার বন্ধুর স্ত্রী যদি আমি না হয়ে অন্য কেউ হতো, তবে কি আপনি তার অনুরোধ রাখতেন না?

সত্যিই, জবাব দিতে গিয়ে শান্তনুর নির্ভীক কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন একটা বিপন্নতা বিড়বিড় করে; স্পষ্ট করে উত্তর দিতে গিয়েও যেন স্পষ্ট করে বলবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না শান্তনু। কথা বলতে গিয়ে বারবার থেমে যায়।

শমিতা বলে—শমিতা না হয়ে কোন নমিতা যদি আপনার বন্ধুর

ঘরে আজ থাকতো, তবে আপনি তারও ঠিক এরকম উপকার করতেন, তারও অসুখে রাঁচি থেকে ওষুধ আনিয়ে দিতেন। বলুন, সত্যি কিনা?

শান্তনু—সত্যি বলেই তো মনে হয়। কিন্তু…।

শমিতা—কি?

শান্তনু—কিন্তু জোর করে বলতে পারছি না।

সড়কের বাঁকে নিমের কুঞ্জের কাছে যখন পৌঁছে যায় শান্তনু আর শমিতা, তখন জোনাকী উড়তে শুরু করেছে। মহুয়াবনের বুকে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছে অপূর্ব। ঘরের বাইরে যেতে কোন চাড় নেই, বাইরে বেড়াবার সাধ প্রায় ভুলে যেতেই বসেছে, এত ক'রে বলা সত্ত্বেও আজ বেড়াতে বের হলো না যে শমিতা, সে-শমিতা ঘরে নেই। স্টেশনের মাস্টারমশাই-এর বাড়িতে গিয়েছে বোধহয়।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই একটা হাস্যোচ্ছল কলরব যেন ঘরে ঢুকছে বলে মনে হয়। শমিতারই গলার স্বর। তার সঙ্গে শান্তনুরও হাসির শব্দ মিশে রয়েছে। হ্যাঁ, শান্তনু আর শমিতা গল্প করতে করতে ঘরের ভিতরে ঢোকে।

শমিতা বলে—তুমি যা বলেছিলে, ঠিকই, সোনাঝুমুরিয়া নদীটা দেখতে চমৎকার। সাদা আর লাল পাথরের উপর দিয়ে কলকল করে জল গড়িয়ে যাচ্ছে; শালবনের ফুরফুরে হাওয়া আর ঘুঘুর ডাক, তুমি যা বলেছিলে, সব সত্যি। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে বড় ভাল লাগে।

অপূর্ব—হঠাৎ…তোমরা দুজনে মিলে…কখন্…?

শমিতা—তুমি চলে যাবার একটু পরেই শান্তনুবাবু এলেন।

অপূর্ব হাসে—শান্তনুটাই তাহলে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে নাচিয়েছে।

শমিতা—মোটেই না। আমিই বেড়াতে যাবার জন্য জেদ করলাম, তারপর শান্তনুবাবু রাজী হলেন।

অপূর্ব—বেশ···ভালো কথা···

হেসে হেসে কথা বলে অপূর্ব। কিন্তু অপূর্বর চোখ-দুটো নিষ্পলক ; চোখের তারা-দুটো সুস্থির। যেন প্রচণ্ড একটা বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে অপূর্বর চোখ-দুটো হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

শান্তনু—অপূর্বকে দেখে মনে হচ্ছে, আজ বেচারার উপর দিয়ে বড়রকমের একটা খাটুনির ঝড় বয়ে গেছে।

অপূর্ব—না, তা নয়। কোন কাজ ছিল না, তবু মিছিমিছি অফিসে বসে এই চারটে ঘণ্টা···বিনা কাজেও ক্লান্ত হতে হয়।

শান্তনু—আমি তাহলে চলি।

শমিতা—চা খেয়ে যাবেন না ?

শান্তনু ব্যস্তভাবে বলে—না ; আজ এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর নয়, আমাকে আজ কুলী-পেমেণ্ট করতে হবে।

শমিতা—এইবার মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেল।

শান্তনু—কিরকম ?

শমিতা—তখন যে বড়-গলা করে বললেন, না সময় নষ্ট হয়নি।

শান্তনু হাসে—যাই হোক্, আমি এখন চলি।

অপূর্বর দিকে তাকায় শমিতা। —তুমিও কি চা খাবে না ?

অপূর্ব হাসে। —অন্তর্যামিনীর মতো এরকম প্রশ্ন করলে বলতে হয়, খাব না।

শান্তনু চেঁচিয়ে ওঠে—অপূর্ব চা খাবে না কেন ? কাল যে ক্রিস্ট্যাল-সুগার এনেছি ; তাই দিয়ে শিগ্‌গির এক কাপ চা করে ওকে দিন।

চলে যায় শান্তনু। ক্রিস্ট্যাল-সুগার দিয়ে চা তৈরীও করে শমিতা। অপূর্বর হাতের কাছে চা-এর কাপ এগিয়ে দিয়ে বেশ খুশির স্বরে কথাও বলে শমিতা,—ভালো চিনি পড়লে, চায়ের রঙ কী সুন্দর হয়, দেখছো?

চায়ের সেই সুন্দর রঙটারই দিকে তাকিয়ে থাকে অপূর্ব। সেই-রকমই নিষ্পলক দৃষ্টি। যেন একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের রঙের দিকে তাকিয়ে আছে অপূর্ব।

—কি হলো তোমার?—ডাক দেয় শমিতা।

—কি বলছো?— উত্তর দেয় অপূর্ব।

—চা খাও।

—খাচ্ছি।

—তবে ওরকম করছো কেন? শরীর খারাপ বোধ করছো?

—না।

—তবে কি মন-খারাপ?—মুখ টিপে হাসে শমিতা।

অপূর্বও হেসে ফেলে চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয়।—কাঠুরে মানুষের মন এত কাঁচা নয় যে একটুতেই খারাপ হয়ে যাবে।

—তার মানে?

শমিতার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অপূর্ব। নিষ্পলক চোখ-দুটো মাঝে মাঝে যেন থরথর করে কেঁপে উঠছে। কিন্তু কী গভীর আর নিবিড় সেই চাহনি। যেন টলমল করছে কালো-দীঘির জল। টলমল করছে একটা স্নেহাতুর পিপাসা।

হাত এগিয়ে দিয়ে শমিতার একটা হাত ধরে অপূর্ব বলে।—তার মানে, কাছে এস।

শমিতার হাতটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে কিছুক্ষণের মতো যেন নিঝুম হয়ে যায় অপূর্ব। তার পরেই শমিতার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে কি-যেন বলতে চেষ্টা করে।

শমিতা—কি বলছো ?

অপূর্ব—অনেকদিন পরে তুমি আজ বাইরে বেড়াতে যাবার সুযোগ পেলে।

শমিতা—হ্যাঁ। এই তিনবছরের মধ্যে মাত্র তো···

অপূর্ব—হ্যাঁ, জানি। আমি তো শুধু বেড়াবার গল্প ক'রে-ক'রেই ফুরিয়ে গেলাম। কাজের ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাই না, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হবার সময়ও হয় না।

শমিতা—তাতে কি হয়েছে ?

অপূর্ব—না, কিছু হয়নি। এখন বরং একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল শান্তনু তবু একটু সময়-নষ্ট স্বীকার করেও তোমাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে। এবার থেকে মাঝে মাঝে, শান্তনু যদি সময় করতে পারে তবে তোমরা দুজনে বেড়িয়ে এস।

শমিতা—বেড়াবার এত শখ নেই। আজ হঠাৎ একবার ইচ্ছে হলো, তাই···

অপূর্ব—আমিও তো তাই বলছি। ইচ্ছে হলেই বেড়িয়ে এস। আমার আশায় থেকো না।

শমিতা হাসে। —তোমার আশায় থেকে এই তিনবছরের মধ্যে মাত্র তো একটিবার···

অপূর্ব—আমি সে-কথাই বলছি, শমিতা।

॥ চার ॥

স্টেশনের মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী বলেন—দেখলেন তো কাণ্ড। আজকাল স্বামীকে ঘরে বসিয়ে রেখে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গেই বেড়াতে বের হচ্ছেন।

চিন্তামণিবাবুর স্ত্রী বলেন—স্বামী অনুমতি দিয়েছেন; নইলে এরকম কাণ্ড সম্ভব হবেই বা কেন?

—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না, কে কাকে ডোবাচ্ছে?

—শমিতাই পাথরবাবুকে ডোবাচ্ছে; পাথরবাবু ডুবছেন।

—উনি বলছিলেন, পাথরবাবুরই দোষ। এভাবে একটা পরস্ত্রীর ফরমায়েস খাটা কি পুরুষমানুষের পক্ষে লজ্জার কথা নয়?

—লজ্জার কথা বইকি।

—কেন পরস্ত্রীর ফরমায়েস খাটে, যদি কোন মতলব না থাকে?

—সেই তো কথা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, অপূর্ববাবু চুপ করে সব সহ্য করেছেন।

—শুনলাম অপূর্ববাবুর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।

—কবে থেকে?

—এই দিন তিন-চার।

—রুগী স্বামীর দেখাশোনা করে তো বউটা?

—হরিয়ার মা বলছিল, পাথরবাবুই জঙ্গলবাবুর সেবা-যত্ন করছে।

—এটা আবার কিরকমের ব্যাপার হলো? পাথরবাবু লোকটাকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে।

—মনে হতে পারে। কিন্তু পাথরবাবুর এখন সেই চক্ষুলজ্জাও নেই।

—অ্যাঁ?

—এখন রাত্রিবেলা আর তাঁবুতে ফেরেন না। বন্ধুর ঘরকেই রাতের আশ্রয় করেছেন।

—সর্বনাশ!

হ্যাঁ, এই তিনদিনের মধ্যে একটি দিনও রাত্রিবেলায় তাঁবুতে ফিরতে পারেনি শান্তনু। শমিতা আপত্তি করেছে; অপূর্বও আপত্তি করেছে। আর শান্তনুও ভেবে দেখেছে, অপূর্বর জ্বরের ঘোর একেবারে কমে না যাওয়া পর্যন্ত রাত্রিবেলাটা এখানে থাকতেই হয়। নইলে শমিতা নিজেকে বড় অসহায় বোধ করবে। কতক্ষণই বা রাত জাগতে পারবে শমিতা? অথচ প্রায় সারারাত ধরে অপূর্বর মাথায় পাখার বাতাস না দিলে, মাথার জ্বালায় সারারাত কাতরাবে অপূর্ব; এক মিনিটও আরামের ঘুম হবে না।

ক্যাপ্টেনেরও সর্দি হয়েছে। বার বার ঘুম ভেঙে যায় আর কাঁদে। ওকে সামলাতেই শমিতাকে প্রায় সারা-রাত-জাগা একটা ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হয়। তার উপর যদি অপূর্বর মাথার জ্বালাকে সামলাতে হয় ...তবে তো...না, শান্তনুই রাত জাগে, অপূর্বর প্রত্যেক ডাকে সাড়া দেয়; জল চাইলে জল, বাতাস চাইলে বাতাস দেয় শান্তনু। শমিতা এক এক বার অপূর্বর ঘরের ভিতরে আসে। শান্তনুই বাধা দিয়ে বলে, আপনি ঘুমোন গিয়ে। আপনার এখানে আসবার কোন দরকার নেই।

...আপনি নিজের দিকটাও একবার দেখবেন।—বিড়বিড় করে শমিতা।

—এ-কথার মানে কি?

—রাত জেগে আপনার শরীর আবার ভেঙে না পড়ে।

অপূর্বও বলে—হ্যাঁ, ভারি তো অসুখ ; সাধারণ রকমের একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা। না হয় মাথার জ্বালাটা একটু বেশি। কিন্তু সেজন্যে তোমার এত রাত জাগবার কোন দরকার হয় না, শান্তনু।

শান্তনু—তুমি চুপ কর।

—তুমি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছো, শান্তনু। আমি তো একটা মরণাপন্ন রুগী নই যে, তুমি এরকম রাত-জাগা দুর্ভোগ সহ্য করবে?

অপূর্বর কোন আপত্তি গ্রাহ্য করেনি শান্তনু। কিন্তু দু'দিন পরেই, অপূর্ব আপত্তির জন্য নয়, বোধহয় একেবারে আকস্মিক একটা করুণ বিদ্রূপের চক্রান্তের জন্য, রোগীকে সেবা করবার জন্য শান্তনুর এই রাত-জাগা দায়িত্বের গর্বটা মিথ্যে হয়ে গেল। জ্বরে পড়লো শান্তনু।

চোখ-দুটো লাল হয়েও ছলছল করছে। শান্তনু একবার সন্ধ্যার অন্ধকারের চেহারাটা দেখবার জন্য জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। তার পরেই শমিতার দিকে তাকিয়ে বলে—আমারও জ্বর এসেছে মনে হচ্ছে ; আমি যাই।

—কি বললেন? কোথায় যাবেন?—চেঁচিয়ে ওঠে শমিতা।

—সাবধান, শান্তনু ; তুমি এরকম অভদ্রতা কোরো না।

ঘর ছেড়ে এখন কোথাও যেতে পাবেনা তুমি।—অপূর্বও রাগ ক'রে কথা বলে।

অগত্যা, বাইরের ঘরের একটি বিছানা। জ্বরের শরীর নিয়ে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে শান্তনু। শমিতা এসে ঘরের বাতির শিখাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—জানালাটা বন্ধ করে দিই?

শান্তনু—কখখনো না। তাঁবুতে ঘুমনো অভ্যেস ; এমনিতে তো ঘরের ভেতরেই ঘুম হয় না ; তার ওপর ঘরের জানালা বন্ধ থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরেই যেতে হবে বোধহয়।

ক্যাপ্টেনকে ফুড খাইয়ে আর ঘুম পাড়িয়ে যখন একটা হাঁপ ছাড়ে শমিতা, তখন বাইরের অন্ধকারে ঝিঁঝির স্বরও যেন ঘুমের ভারে

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। স্টেশনের দিকের অন্ধকারের মধ্যে একটা ইঞ্জিন হাঁসফাঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ মহুয়ামিলানের রাতের বুকে আর কোন শব্দ নেই।

কিন্তু ফরেস্ট-রেঞ্জারের এই কোয়ার্টারের দুটি ঘরের দুটি মৃদু আলোর বুকে দু'রকমের দুটি করুণ আক্ষেপের শব্দ আস্তে আস্তে বাজছে। এঘরে মাথার জ্বালায় কাতরাচ্ছে অপূর্ব; আর ও-ঘরে—সত্যিই তো, চম্‌কে ওঠে শমিতা, যেন চাপা-চাপা নিশ্বাসের ব্যথা শব্দ করে বাজছে। শান্তনুর জ্বর কি বাড়লো?

স্টেশনের দিক থেকে আর কোন শব্দ নেই; একটা ইঞ্জিনের হাঁসফাঁস শব্দের রেশটুকুও মিলিয়ে গিয়েছে; ইঞ্জিনটা এখন বোধহয় অনেক দূরে অন্য একটা জঙ্গলের ঠাণ্ডা হাওয়া আর শান্ত অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মনের সুখে ছুটে চলেছে; কিংবা, জিরোবার জন্যে কোথাও এসে একেবারে থেমে গিয়েছে। দেখতে বেশ লাগে, বুকের বয়লারের ভেতরে আগুন গণগণ করছে, আর ট্যাঙ্কের হোস থেকে ঝ'রে-পড়া জলের ধারা গলগল করে খেয়ে তেষ্টা মেটাচ্ছে একটা ইঞ্জিন। স্টেশনের দিকে গেলেই ইঞ্জিনের এই তেষ্টা মেটাবার দৃশ্যটা দেখবার ইচ্ছে হতো; দেখতেও পেত শমিতা; দেখতে ভালোও লাগতো।

কিন্তু আর তো চুপ করে বসে থাকা যায় না। শমিতার ঘরের আনন্দ যে বিশ্রী একটা জ্বরের জ্বালায় কাতরাচ্ছে। এই তিন-বছরের মধ্যে কোন কালবৈশাখীর রাতও শমিতাকে এত ভাবিয়ে তোলেনি। কোন দিন কোন উদ্বেগের জন্য রাত জাগতে হয়নি। আজ কিন্তু জাগতে হবে। না জেগে উপায় কি?

অপূর্বর কাতরানির শব্দ, যেন কতগুলি কাটা-কাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া আক্ষেপের আওয়াজ। মাথার ভেতরে জ্বালাটা কটকট করলে আর্তনাদের ছন্দটা এইরকমই কাটা-কাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে যায়।

ওরকম মানুষের মাথার জ্বালাটা ওরকম হবেই বা না কেন? দিন-রাত শুধু কাজের চিন্তা। রিজার্ভ-ফরেস্টের দশটা নিম আর বিশটা তেঁতুলের জন্যে ওর যত উদ্বেগ, তার অর্ধেক উদ্বেগও বোধহয় ওর নিজের জন্য কিংবা নিজের ঘরের জন্য নেই। সেদিন তো স্টেশনের মাস্টারমশাইকে একেবারে হাসিয়ে ছেড়েছিল অপূর্ব; ক্যাপ্টেনের বয়সটাও ঠিক করে বলতে পারেনি। মাস্টারমশাইও তেমনই মুখকাটা মানুষ। বেশ মিষ্টি করে শুনিয়ে দিতে ছাড়লেন না—মশাই দেখছি…যাকে বলে… অর্থাৎ আমাদের কের্তনে কবিরা যে-কথা বলেছেন—ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।

যাক্‌গে, ওসব অভিযোগের কথা ভেবে এখন আর মনটাকে তেতো করে লাভ নেই। এখন যা করতে হবে, সেটাই করতে হয়। ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে আর ভালো করে নিংড়ে নিয়ে, সেই তোয়ালে দিয়ে আস্তে আস্তে ওর কপালটা একবার মুছে দিতে হবে; তারপর অন্তত একটা ঘণ্টা বেশ জোরে জোরে বাতাস দিতে হবে। তাহলেই জ্বালাটা কমবে; ঘুমিয়েও পড়বে অপূর্ব।

আঃ; শমিতার বুকের ভেতর থেকেই যেন একটা আহত স্বপ্নের ব্যথা ঠিকরে বের হয়েছে। শান্তনুবাবু কি-রকম অদ্ভুত শব্দ করে হাঁপাচ্ছেন! তাঁবুর ভেতরে শোওয়া অভ্যেস, ভদ্রলোকের প্রাণটা যে সত্যিই দমবন্ধ হয়ে যাবার ব্যাথায় ছটফট করছে। কিন্তু জানালা তো বন্ধ করেনি শমিতা। ঘরটাও খুব ছোট নয়। তবে এভাবে হাঁপায় কেন শান্তনুবাবুর নিঃশ্বাস? বুকের ভিতরটা কটকট না করলে, কারও নিঃশ্বাসের শব্দ এমন করুণ হয়ে যেতে পারে না। স্বপ্নের মধ্যে কাঁদছে নাকি শান্তনু?

কিন্তু…শান্তনুর স্বপ্ন যে শমিতার এই ঘরটাই। শমিতার এই ঘরোয়া শান্তি যে শান্তনুরই যত্নের সৃষ্টি। এই তো, চোখের সামনে এখনো জ্বলজ্বল করছে এই-যে আলমারিটা, যার কাচের উপর আলো

পড়ছে ; সেটাকে এই সেদিন নিজের হাতে ঘষা-মাজা করেছে শান্তনু। স্পিরিট দিয়ে আলমারির কাচগুলিকে মুছেছে। পুরনো আলমারিটা একেবারে নতুনের মতো দেখাচ্ছে।

এখনও উঠে এসে ঘরের চারদিকে তাকালে, এমনকি শমিতার মুখের দিকে তাকালেও দেখতে পাবে শান্তনু : সব ঠিক আছে ; কিছুই বদলে যায়নি ; এই ঘরকে সুখী করবার জন্যে যেমনটি সাজিয়েছে শান্তনু, এই ঘর এখনও ঠিক তেমনটি সেজে আছে। আজকের রাতটাও শমিতার জীবনে আতঙ্ক হয়ে উঠতে পারছে না ; কারণ শান্তনু কাছে আছে। একেবারে শমিতারই সংসারের ঐ ঘরটির ভিতরে।

গম্ভীর নয়, বিষণ্ণ নয়, উদ্বিগ্ন নয় শমিতার মুখটা। আয়নার কাছে এসে দাঁড়িয়ে এলোমেলো খোঁপাটাকে বাঁধতে গিয়ে নিজের চোখেই দেখতে পায়, শমিতার ঠোঁট-দুটো যেন গভীর তৃপ্তির হাসিতে বিহ্বল হয়ে রয়েছে।

অপূর্বর মাথার জ্বালাটা আরও দুরন্ত হয়ে উঠেছে। কাতরানির শব্দটা আরও জোরে বাজছে। ব্যস্তভাবে পাখাটা হাতে নিয়ে অপূর্বর ঘরের দিকে এগিয়ে যায় শমিতা।

কিন্তু অপূর্বর ঘরের দরজার কাছে গিয়েই হঠাৎ থম্‌কে যায় শমিতা, যেন পিছন থেকে আর একটা কাতরানির শব্দ শমিতার আঁচল ধরে আচমকা টান দিয়েছে। কাতরাচ্ছে শান্তনু। শান্তনুর জ্বরের জ্বালাটাও অদ্ভুত রকমের দুরন্ত হয়ে উঠেছে ; শান্তনুর নিঃশ্বাসের শব্দটা যেন জলে-ডোবা মানুষের দীর্ঘশ্বাসের মতো এক এক ঝলক বেদনার করুণ বুদ্‌বুদ্‌ উথলে দিয়ে আবার তলিয়ে যাচ্ছে।

শমিতার স্তব্ধ চেহারাটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে ; যেন সারা প্রাণটাই হঠাৎ বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। কী হলো শান্তনুর ? কিসের এত কষ্ট ? কেন এত কষ্ট পাচ্ছে শান্তনু ? উতলা দুর্ভাবনার এই উতলা

প্রশ্নগুলির মতো চোখ-মুখের চেহারাটাকেও উতলা করে বাইরের ঘরের দিকে চলে যায় শমিতা। দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, বুকেরই কষ্ট! দু'পাশে হাত-দুটো এলিয়ে দিয়ে, যেন বুকটাকে মুক্ত করে দিয়ে শুয়ে আছে শান্তনু। জ্বরের শরীরটা গভীর ঘুমের ভারে নিঝুম হয়ে আছে। শুধু ওঠা-নামা করছে বুকটা।

বুকটা যেন খোলামেলা একটা একলা মাঠের বুক। কোন ছায়া নেই, কোন ফুলও ফোটে না, একটা পাখিও ডাকে না—একটা পিপাসিত শূন্যতা। রোদের জালায় সেই শূন্যতা তাতারসির মতো শুধু ছলছল করে।

হাত তুলে চোখের কোণ-দুটো মুছে ফেলে শমিতা; বোধ হয় শমিতারই দুই চোখের উপর একটা সজল তাতারসির কাঁপুনি হাঠাৎ ছলছল করে উঠতে চাইছে।

অনেকক্ষণ ধরে দরজার কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে থাকে শমিতা। শমিতার চোখ-দুটো নিষ্পলক, দৃষ্টিটা কঠোর; যেন নিজের উপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞাকে মনে-মনে বরণ করছে শমিতা। শান্তনুর বুকের এই কষ্টটা যে শমিতারই একটা নির্মম অপরাধের কীর্তি। শান্তনুর বুকের কষ্টটা যে এই ঘরের মধ্যে থেকেও পর হয়ে থাকা একটা একলা প্রাণের কষ্ট।

কিন্তু তাঁবুবাসী এই মানুষটার প্রাণে সেই বোধটুকুও নেই বোধ হয়। তা না হলে, একদিনও…ভুলেও…একটা কথাও কি…শুধু একটা মুখের কথা বলতে কি বাধা ছিল? বলে ফেললেই বা কি এমন দোষ হতো?

শান্তনুর এই খোলামেলা বুকটার শূন্যতার দিকে তাকিয়ে শমিতার চোখের দৃষ্টিটা যেন রাগ করে কটকট করতে থাকে। যেন প্রতিশোধ নেবার একটা দুর্বার স্পর্ধা কটকট করে জ্বলছে। শূন্যতা নয়,

শান্তনুর বুকের উপর একটা নির্বিকার অহংকার থমথম করছে। মানুষকে শুধু করুণা করে, উপকার করে, সাহায্য করে, আর, তারপর সব ভুলে গিয়ে একটা জঙ্গলের তাঁবুর দিকে ছুটে চলে যায় ঐ অহংকার।

ছিঃ, এরকম একটা অসহায় একলা মানুষের উপর রাগ কেন? মানুষটা যে আজ এতদিন পরে এই প্রথম তার নিজেরই যত্নের গড়া একটা ঘরোয়া সুখের বিছানায় শুয়ে থাকবার সুযোগ পেয়েছে। ওর উপর রাগ করবার অধিকার কারও নেই। শমিতারও নেই। বরং ওরই এই নালিশ করবার অধিকার আছে, ওর মাথায় কেন এখন পর্যন্ত সামান্য একটা পাখার বাতাসও পড়লো না?

দরজা পার হয়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে শমিতা। জ্বলন্ত বাতিটার দিকে একবার তাকায়।

না থাক্‌, বাতি নিভিয়ে দিলেই বা কী লাভ হবে? শান্তনুর বুকের কষ্টটা কি এতই বোকা যে কিছুই বুঝতে পারবে না, কে আজ লুটিয়ে পড়লো ওর এই একলা পড়ে থাকা আর খোলামেলা বুকটার উপর?

চম্‌কে ওঠে শমিতা; যেন হঠাৎ একটা আগুন-লাগা জ্বালা শমিতার মুখের উপর ছিটকে পড়েছে। হাতের পাখাটা ছোট্ট একটা শব্দ করে মেজের উপর পড়ে যায়। ছ'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপতে থাকে শমিতা, যেন ছ'হাত দিয়ে খিমচে ধ'রে নিজের চোখ ছুটোকে উপড়ে ফেলতে চায় শমিতা।

ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে বারান্দা পার হয়ে, অন্ধকারে ভরা উঠোনটাকেও পার হয়ে রান্নাঘরের দরজার শিকলটাকে ধরে কাঁপতে থাকে শমিতা, যেন ফাঁসির দড়ি আঁকড়ে ধরে প্রাণটাকে বাঁচাতে চাইছে পাগল-হয়ে-যাওয়া একটা মানুষ।

ছিঃ, এরপর আর বেঁচে থাকবারই বা দরকার কি? এমন ভয়ানক

ইচ্ছের দাগ নিয়ে কোন মেয়েমানুষের পক্ষে আর বেঁচে থাকাও যে উচিত নয়।

মা-গো! মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আর কপালটাকে মেজের উপর ঘষে-ঘষে ফোঁপাতে থাকে শমিতা।

বেশ কিছুক্ষণ হলেও অনেকক্ষণ নয়। শমিতার লুটিয়ে-পড়া প্রাণটা যেন কান্নায় ভেজা দীনতার সব কাদা হঠাৎ ঝাড়া দিয়ে আর দূরে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বেশ শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় শমিতা। খোঁপাটাকেও শক্ত করে বাধে, যেন অদৃষ্টটারই সঙ্গে একটা চরম বোঝাপড়া করবার জন্য তৈরি হয় শমিতা।

কতক্ষণ ওভাবে মেজের উপর লুটিয়ে পড়েছিল, তাও জানেনা শমিতা, কিন্তু ভোর হতে যে আর খুব বেশী বাকী নেই, সেটা বুঝতে পারে। মহুয়ামিলানের রাতের শেষ ঘুমের প্রহরটার বুকের উপর দিয়ে তুরু-তুরু করে চলে যায় যে কয়লা ট্রেনটা, সেটা চলে যাচ্ছে; তুরু-তুরু করে একটা গড়ানো শব্দ রাতের স্তব্ধতাকে শিউরে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

সোজা হেঁটে এসে, ঘরের ভিতরে ঢুকে ঘুমন্ত অপূর্বর বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায় শমিতা। অপূর্বর কপালে হাত রাখে শমিতা। একি! জ্বর একেবারে নেই বলেই যে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ চোখ মেলেই অপূর্ব হেসে ফেলে। —জ্বর নেই বলে মনে হচ্ছে, শমিতা।

—ঘুম হয়েছিল?

—ঘুম? এই তো মিনিটখানেক আগে ঘুম ভেঙেছিল। তারপর আবার ইচ্ছে করেই আর-একটা ঘুম আনবার জন্যে···

—বেশ, ঘুমোও তুমি। কিন্তু···

—কি?

—আমি যে ঘুমোতে পারছি না।

—কেন ?

—ঘুমোতে পারছি না···

—আবার চেষ্টা কর ; এখনও রাত আছে।

—তা, চেষ্টা না হয় করবো। কিন্তু তুমি আমাকে···

—কি ?

অপূর্বর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে শমিতা। —বলো, তুমি আর আমাকে ঘরের সব কাজ আর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে একলা ফেলে দিয়ে আর নিজে আলগা হয়ে শুধু অফিস আর গল্পের বই নিয়ে পড়ে থাকতে পারবে না ?

অপূর্ব ধড়ফড় করে উঠে বসে। দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা করুণ অনুতাপের ছায়া। শমিতার পিঠে হাত বুলিয়ে অপূর্ব যেন নিবিড় সান্ত্বনার স্বরে বলে—সত্যিই, আমি বুঝতে পারিনি, শমিতা। ঘরের কাজে ফাঁকি দেওয়া আমার একটা অভ্যাস ; কিন্তু সেটা যে তোমার পক্ষে এত কষ্টের ব্যাপার হবে, সেটা বুঝতে পারিনি।··· কিন্তু তুমি ভেব না ; আমি কথা দিচ্ছি··· ।

শমিতা—সকালবেলা যখন অফিসে যাবে, তখন ক্যাপ্টেনকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে।

অপূর্ব—বেশ তো। কাল অবশ্য অফিসে যাব না। কিন্তু পরশু থেকে···হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তুমি শুধু ওকে জামা-টামা পরিয়ে···

শমিতা—না ; তুমি নিজে ওকে কোলে বসিয়ে দুধ খাইয়ে আর জামা-টামা পরিয়ে, তারপর নিয়ে যাবে।

অপূর্ব হাসে। —খুব ভালো কথা।• আমি কথা দিচ্ছি। তুমি এবার ঘুমোতে যাও।

শমিতা—স্টোভটা একটু খারাপ হয়েছে।

অপূর্ব—মেরামত করা দরকার বোধ হয়।

শমিতা—হ্যাঁ।

অপূর্ব—বেশ তো।

শমিতা—বেশ তো নয়। তুমি কালই একটা ব্যবস্থা করবে। আমি আর এসব কাজের জন্য বাইরের কোন মানুষকে তাগিদ দিয়ে বিরক্ত করতে পারবো না।

অপূর্ব—কোন দরকার নেই। চন্দ্রপুরা সার্কেলের বীট-সর্দার কেয়ামত আলি যেদিন আসবে, সেদিন মনে করিয়ে দিয়ো।

শমিতা—আমি মনে করিয়ে দিতে পারবো না।

অপূর্ব—বেশ তো, আমিই না-হয় তোমাকে মনে করিয়ে দেব। স্টোভটাকে অফিসে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। কেয়ামত এসব মেরামতী কাজ ভালোই জানে।

শমিতা—আর···

অপূর্ব—আর আবার কি? এবার ঘুমোতে যাও।

শমিতা—আমি আর তোমাকে সাধতে পারবো না; মনে করিয়েও দেবো না। বিকেলবেলা যেদিন তোমার কাজ থাকবে না, সেদিন তুমি নিজেই আমাকে জোর ক'রে···

অপূর্ব—কি বলতে চাও বলো। থামলে কেন?

শমিতা—আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

অপূর্ব—কিন্তু জোর করবো কেন? তোমার কি বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না?

শমিতার মাথাটা যেন একটু ঝুঁকে পড়ে। অপূর্বর হাতটা আরও একটু নিবিড়তার ছোঁয়া দিয়ে চেপে ধরে আস্তে আস্তে শমিতা বলে—এত ইচ্ছে করে বলেই তো বলছি।

॥ পাঁচ ॥

বেশিদিন নয়, মাত্র সাতটা দিন, এর মধ্যে মহুয়ামিলানের জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের ঘটনা বলতে শুধু এইটুকু ঘটেছে যে, চিন্তামণিবাবুর বদ্‌লির অর্ডার এসে গিয়েছে।

আর, ফরেস্ট-রেঞ্জারের এই কোয়ার্টারে, জঙ্গলবাবুর এই সুন্দর ক'রে সাজানো-গোছানো সংসারের ঘরে পাথরবাবুর আসা-যাওয়ার ব্যস্ততা বেশ কমে গিয়েছে।

শান্তনু আসে আর চলে যায়। সাইকেলটা তেমনই ক্রিং-ক্রিং করে বাজে। কিন্তু ক্যাপ্টেন আর ঘরের ভিতর থেকে দু'হাত তুলে নেচে-নেচে ছুটে বের হয়ে আসে না। বাড়িতে নেই ক্যাপ্টেন। সে তখন অফিস-ঘরের ভিতরে অপূর্বর চোখের সামনেই একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আর তূলোর একটা কুকুরছানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে লাফাচ্ছে। গোমো থেকে কুকুরছানাটাকে আনিয়েছে অপূর্ব। গার্ড চক্রবর্তীর হাতে টাকা দিয়েছিল অপূর্ব; চক্রবর্তী ওটাকে গোমো থেকে কিনে নিয়ে এসেছে।

—আপনি সেদিন কি যে বলেছিলেন...বোধহয় এক বোতল স্পিরিটের কথা...সেটা বোধহয় এখন যোগাড় করে ফেলা দরকার।

মাঝে একদিন এই দরকারের কথাটাও বলেছিল শান্তনু; শমিতা বলেছিল—না, এখন আর দরকার নেই। স্টোভটাই এখন খারাপ হয়ে পড়ে আছে।

শান্তনু—তাহলে স্টোভটাকে মেরামত করবার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

শমিতা—সে-ব্যবস্থাও হয়ে আছে।

এই সাতদিনের মধ্যে ফরেস্ট-রেঞ্জারের এই কোয়ার্টার যেন নতুন রকমের সুরে কথা ব'লে শান্তনুকে জানিয়ে দিয়েছে, এই ঘরের দরকারে শান্তনুর আর দরকার নেই।

তাঁবুর মানুষ শান্তনু দত্ত তবু ছুটে ছুটে আসে; এসেই ক্যাপ্টেনের খোঁজ করে। শমিতা হেসে হেসে বলে—ক্যাপ্টেন আজকাল বেশ খুশি মেজাজে মশগুল হয়ে আছে।

—কোথায় ক্যাপ্টেন?

—বাপের কোলে চড়ে বোধহয় এখন স্টেশনের দিকে···

শান্তনুর চোখ-দুটো যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের আঘাতে চম্‌কে ওঠে। —অপূর্বর কোলে চড়ে?

শমিতা—হ্যাঁ।

বাইরে রাখা সাইকেলটার দিকে তাকায় শান্তনু; তারপর দূরের আকাশের দিকে। চোখের দৃষ্টিটা যেন একটা ভীরু আতঙ্কের দৃষ্টি। যেন একটা ছেলে-ধরার কোলে চড়ে পালিয়ে গিয়েছে ক্যাপ্টেন; এই দুর্ঘটনার সংবাদটাকেই হেসে হেসে বোঝাতে গিয়ে অদ্ভুত কথা বলছে শমিতা, ছেলেটা আজ বাপের কোলে চড়ে···। তবে কি ছেলেটা এতদিন নিছক একটা মিথ্যার কোলে চড়ে···না, আর দাঁড়িয়ে থাকে না শান্তনু। বারান্দা থেকে নেমে সাইকেলটার দিকে এগিয়ে যায়।

সাতদিনের পর আরও সাতটা দিন। এর মধ্যে শুধু একটি দিন এসেছিল শান্তনু। কিন্তু শান্তনুর সাইকেলটা এখন আর হুহু করে ছুটে আসে না। অনেক দূরের ফাঁকা প্রতিধ্বনির শব্দের মতো একটা দ্রুত্বসর্বস্ব উল্লাস যেন উদাস গতিতে কোনমতে দৌড়ে আসে।

বারান্দার উপর দুই চেয়ারে বসে দুই বন্ধুর গল্পও একদিন খুব জমে উঠেছিল। সেই কুষ্টিয়ার গল্প। বাদুড় ধরবার জন্য একদিন

সন্ধ্যা হতেই দুই বন্ধুতে মিলে দুই গাছের মাথার উপর চড়ে মস্তবড় যে জালটা ঝুলিয়েছিল, সেটা যে এমন একটা ঠাট্টা করে সব পরিশ্রম ব্যর্থ করে দেবে, দুজনের কেউই আগে সেটা ভাবতেও পারে নি। বাদুড় নয়, অনেকগুলি কাক ধরা পড়েছিল সেই জালে।

অপূর্ব বলে—কুষ্টিয়ার কাকও যে নিশাচর, এটা তোমার জানা থাকা উচিত ছিল, শান্তনু।

শান্তনু—কেন ?

অপূর্ব—কুষ্টিয়া তোমার দেশ।

শান্তনু—কত কথাই তো আগে জানা উচিত ছিল ; কিন্তু আগে থেকে সবই তো জানা যায় না।

অপূর্ব—তার মানে ?

শান্তনু—বড়-জ্যেঠামশাই যে খড়ম-পেটা করতে এত এক্সপার্ট, দেশের বাড়ির এই বাস্তব সত্যটাও তো আগে জানতে পারিনি।

শমিতাও এই গল্পের আসরের একপাশে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। গল্প শুনে হেসে ফেলে।

শান্তনুও বোধহয় বুঝতে পারে ; মুরি থেকে ছেড়ে যে ট্রেনটা সেদিন রাতের কুয়াশার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছিল, সেই ট্রেনের সেই কামরাটারই ভিতরে বসে অপূর্বর সঙ্গে আজও গল্প করছে শান্তনু, আর শান্তনুর সঙ্গিনী শমিতা সে গল্প শুনে হাসছে। মাঝখানে তিন বছরের কোন ইতিহাস নেই, ঘটনা নেই, কিছুই নেই।

মনে হচ্ছে ওপাশের দরজা দিয়ে বের হয়ে হরিয়ার মা বোধহয় ক্যাপ্টেনকে কোলে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। আর মুখ ফিরিয়ে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করে না শান্তনু। বরং, বেশ চেষ্টা করে ঘাড়টাকে শক্ত করে শুধু এই গল্পেরই আসরের একটা মানুষ হ'য়ে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে শান্তনু। তার পরেই চলে যায়।

শান্তনুকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হতে হলো, আর সেই আশ্চর্যের

আবেশ যেন একটা জ্বালা হয়ে শান্তনুর দু'চোখের দৃষ্টি থেকে ছাই ঝরাতে শুরু করে দিল সেদিন, যেদিন খুব খুশি হয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে উঠলো অপূর্ব। —আজ এখানে তোমার নেমন্তন্ন, শান্তনু।

শমিতাও ঘরের ভিতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে এসে বলে —হ্যাঁ।

অপূর্ব—হ্যাঁ তো বললে, কিন্তু অতিথি বেচারাকে আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে, সেটা বলো।

শমিতা—বড়জোর আর এক ঘণ্টা।

অপূর্ব—তবে যাও, একটু চটপট হাত চালিয়ে…

চলে যায় শমিতা। খুবই ব্যস্ত শমিতা। অপূর্বও কিছু কম ব্যস্ত নয়। হন্তদন্ত হয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে পাঁচ মিনিট পরেই আবার ফিরে আসে অপূর্ব। হাতে চায়ের কাপ।

শান্তনুর সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়েই অপূর্ব বলে—চা-টা আমিই তৈরি করলাম। শমিতাকে আজ আর এসব ছোটখাটো কাজে ভিড়তে দিইনি।

কিন্তু একটু ভুল করেছে অপূর্ব; এই কাপে চা না আনলেই ভালো হতো। এই কাপে এবং এইরকম আরও তিনটে কাপে ফাটা দাগ আছে; সেই জন্যে এই চারটে দাগী কাপকে শেল্‌ফের নীচের তাকে রেখে দিয়েছিল শান্তনু। ওর মধ্যে শুধু একটাকে মাঝে মাঝে চিনি রাখবার কাজে ব্যবহার করা হতো। এটাই বোধহয় সেটা। কাপটার গায়ের চারদিকে চিনির দাগ লেগে আছে। বোধহয় হাতের কাছে যে কাপ পেয়েছে, তাতেই চা করে নিয়ে এসেছে অপূর্ব। জানে না অপূর্ব, ঘরের পূবদিকের দেয়ালের তাকে যে-কাপগুলো সাজানো রয়েছে, শুধু সেগুলোই চা খাওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

চা খায় শান্তনু।

অপূর্ব বলে—বিশেষ কিছু নয়। ছানার ডালনা আর···আর চামরমণি চালের ভাত।

শান্তনু বিড়বিড় করে। —খুব যোগাড় করেছো তো।

অপূর্ব—কিছ্‌ছু না। জোগাড় করতে একটুও ঝঞ্ঝাট ভুগতে হয়নি। ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম; সোজা হাঁটা দিয়ে সীতাপুরের সাহুজীর বাড়িতে গিয়ে···

শান্তনু—সীতাপুর? সেটা তো এখান থেকে কম করেও আড়াই মাইল।

অপূর্ব—তা তো হবেই। সাহুজীর কাছ থেকে সের দশেক চামরমণি আদায় করেছি। আর ছানার কথা তো আগেই হরিয়াকে বলে রেখেছিলাম। চান্দোয়া বাজারের এক হালুয়াই-এর ঘর থেকে এক সের ছানা এনে দিয়েছে হরিয়া।

কথা থামিয়ে রেখে ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে অপূর্ব। ঘরের ভিতরে যায়, আর আচারের দুটো শিশি নিয়ে এসে বারান্দার একদিকে ছড়ানো রোদের মধ্যে রেখে দেয়।

অপূর্ব বলে—শমিতার শরীরটা এই দু'দিন ধরে বেশ একটু কাহিল হয়েই আছে। আমিও ওকে আর বেশি ব্যস্ত হতে দিই না। হরিয়ার মা না-থাকলে, জলটা আমিই কুয়ো থেকে তুলে দিই। আজ অবশ্য সকালে আমি বাড়ি ছিলাম না ব'লে, আর হরিয়ার মা আসতে দেরি করেছিল ব'লে, শমিতাকেই জল তুলতে হয়েছে। তাও, না তুললেও চলতো, যদি আজ অতিথি-সৎকারের ব্যাপারটা না থাকতো।

না, শান্তনুর মনেও আর কোন সন্দেহ নেই। এই ঘরেতে শান্তনু আজ একটা অতিথি। অপূর্ব আর শমিতা আজ এক অতিথিকে ছানার ডালনা আর চামরমণি চালের ভাত খাইয়ে তুষ্ট করবার জন্য সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। অপূর্বর হাত আর শমিতার হাত, দুটি সুখী সাথীর উৎসাহিত হাতের মতো মিলে-মিশে কাজ করছে।

একটা ঘরোয়া সুখ আর শান্তির এই হাসি-হাসি ব্যস্ততার দৃশ্যটা দেখে আর খুশি হয়ে চলে যাবে শান্তনু নামে একজন আগন্তুক।

ঠিকই বলেছিল শমিতা। রান্না শেষ করতে আর এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি।

খাওয়ার পালা সাঙ্গ হতেও আর বেশি দেরি হয় না। আর, শান্তনুর ঢেঁকুর-তোলার শব্দ শুনেও বুঝতে বাকী থাকে না যে, বেশ তুষ্ট হয়েছে শান্তনু। শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি-মনের ধন্যবাদটাও জানাতে ভুলে যায় না শান্তনু। —বেশ, বেশ চমৎকার হয়েছে রান্নাটা।

শমিতা বলে—ইচ্ছে আছে, আর একদিন…

উঠোনের দিকে একটু ব্যস্তভাবে এগিয়ে যেয়ে একটা ভেজা কাপড়কে দড়ির উপর মেলে দিতে দিতে অপূর্ব বলে —হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে একদিন খাঁটি বাঙাল স্টাইলে পিঠে তৈরি করে তোমাকে খাওয়াবো।

শান্তনু হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—চলি এবার।

শমিতা—শুনলেন তো?

শান্তনু—কি?

শমিতা—উনি যা বললেন।

শান্তনু—পিঠে খাবার কথা?

শমিতা—হ্যাঁ।

শান্তনু হাসে। —সেটা বোধ হয় আর…না, বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই এই কপালে আর জুটবে না।

শমিতা—কেন?

শান্তনু—আমি যে কালই চম্পট দিচ্ছি।

শমিতা—তার মানে?

শান্তনু—জয়গড়ের তাঁবু এবার বেশ একটু দূরের দিকে চললো।

শমিতা—কোথায় ?

শান্তনু—এ-জেলাতেই নয়, একেবারে সিংভূমে।

শমিতা—কেন !

শান্তনু—তিনবছর ধরে ওদিকে একটা জায়গা ইজারা নেওয়া আছে। ভালো জাতের ফেলস্পারের একটা ডাঙা। রেলওয়েও এখন বলছে, খুব তাড়াতাড়ি তোমার ফেলস্পার সরাও, মীটার-গেজ লাইনটা আর বেশিদিন থাকবে না।

আর কোন প্রশ্ন নয়, কোন কথাও নয়। শুধু চুপ ক'রে আর মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শমিতা।

কিন্তু শান্তনু আর দাঁড়িয়ে থাকে না। ঘর ছেড়ে বারান্দা, আর বারান্দা থেকে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যায়; যেন, সত্যিই একটা ট্রেনের কামরা থেকে নেমে, জীবনের এক পরম গন্তব্যের দিকে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যাচ্ছে শান্তনু। পিছনের দিকে আর তাকাবার দরকার নেই। তাকিয়ে দেখবার মতোও কিছু নেই। যেটা আছে, সেটা অপূর্বর জীবনে একটা ট্রেনেরই কামরার মতো দু'দণ্ডের একটা নীড়।

তাও নয়; ওটা অপূর্ব আর শমিতার জীবনের ঘর। শান্তনু সেখানে একটা মূর্খ অনধিকার-প্রবেশের ছায়া মাত্র।

শমিতার স্তব্ধ মূর্তিটা হঠাৎ চমকে ওঠে। সত্যিই চলে যাচ্ছে শান্তনু। সত্যিই যে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা ধরে গেটের দিকে তাকিয়েছেন শান্তনুবাবু।

এগিয়ে যায় শমিতা। শান্তনুর কাছে এসে আর হেসে-হেসে বলে—আবার কবে দেখা হবে বলুন ?

শান্তনু—কেমন করে বলবো বলুন ?

শমিতা—কিন্তু একটা কথা অন্তত বলুন।

শান্তনু—কি ?

শমিতা—আপনি আর এভাবে তাঁবুর মানুষ হয়ে…

শান্তনু—বলুন, কি বলছিলেন ?

শমিতা—আপনি বিয়ে করুন, শান্তনুবাবু।

শান্তনু চেঁচিয়ে হেসে উঠে। —সেই তিনবছর আগের পুরনো কথাটা, সেই ট্রেনের কামরার ভেতরে যে-কথাটা হয়েছিল…আপনিই বোধহয় বলেছিলেন যে…।

শমিতা হাসে—হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম, কলকাতায় মাসীমাকে লিখবো, যেন একটি ভালো মেয়ের খোঁজ করেন।

শান্তনু—লিখেছিলেন চিঠি ?

শমিতা—না।

শান্তনু—কেন ?

শমিতা—একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

শান্তনু—কেন ভুলে গিয়েছিলেন ?

শমিতার মুখটা করুণ হয়ে বিড়বিড় করে—জানি না, কেন ভুল হলো, কেন যে… ।

শান্তনু—ভালোই করেছিলেন।

শমিতা—না ; একটুও ভালো করিনি । আমি কলকাতায় মাসীমাকে শিগ্‌গির চিঠি দেব, যেন খুব তাড়াতাড়ি একটি ভালো মেয়ের খোঁজ দেন।

শান্তনু—ভালো মেয়ে মানেটা কী ?

সামান্য একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে শান্তনুর গলার স্বরের ভিতরে যেন একটা বজ্রের চাপা আর্তনাদ ছটফট করে উঠেছে।

শমিতা বলে—ভালো মেয়ে…মানে, যেন আমার মতো মেয়ে না হয়।

কি ভয়ানক ভীরু হয়ে গিয়েছে শমিতার চোখ। ঝাপসা হয়ে গিয়েছে চোখের তারা দুটো।

শমিতার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই হেসে ফেলে শান্তনু। —ছিঃ, আপনি ওরকম কথা বলছেন কেন? আমি তো কিছুই মনে করিনি। আবার মনে···না, কোন নালিশ নেই। যাক্, কলকাতার মাসীমাকে কিন্তু চিঠি দেবার কোন দরকার নেই।

দূরের আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে শান্তনু। আর, গেট পার হয়ে সড়কের উপর উঠতে আধমিনিটেরও বেশি সময় লাগে না।